কার্য্য। কিন্তু, বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতে, মায়াময় সংসারের কুটিল মায়া, আমার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান প্রতি-বন্ধক হইল। পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র পরিশোভিত নভোমণ্ডলে সহসা নবঘন প্রকাশিত হইয়া, চন্দ্রমার প্রদীপ্ত রশ্মি আচ্ছাদন করিলে, ভূমণ্ডল যেরূপ হঠাৎ অন্ধকারাবৃত হয়, আমার প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, সহসা মায়াময় মেঘজাল উত্থিত হইয়া, হৃদয়ের পবিত্র আলোক নির্ব্বাণ করিয়া মনকে সেইরূপ দুঃখান্ধকারে পূর্ণ করিল। চক্ষুর দর্শনক্রিয়া লোপ হইল। মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। সম্মুখদিকে গমন করিতে, চরণ আর অগ্রসর হইল না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। যে স্থানে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, সে স্থানটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ক্রোশাধিক বিস্তৃত একটী প্রান্তর মাত্র। প্রান্তরের দুই দিকে নিবিড় অরণ্য, একদিকে সুদূরবাহিনী বেগবতী স্রোতস্বতী, অপর দিকে বিবিধ তরুরাজিভূষিত সুরম্য হর্ম্ম্যে পরিশোভিত মদীয় জন্মভূমি। কেবল দুই একটী অশ্বত্থ, বট ও বৃহৎ বৃহৎ ঝাউ বৃক্ষ ভিন্ন প্রান্তরের অপর সমুদয় স্থান শ্যামল নবদূর্ব্বাদলে মণ্ডিত। যেন বন্য জন্তুগণের বিশ্রামের জন্য, পরম কারুণিক পরমেশ্বর, এই সমতল ভূমির

উপর বিনালঙ্কারে পরিশোভিত, সবুজবর্ণে চিত্রিত অপূর্ব্ব গালিচা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এই ঘোর নিশাকালে, এরূপ স্থানে একাকী অবস্থান করা প্রথম সংসারত্যাগী যুবকের পক্ষে, কেমন ভীষণ ব্যাপার তাহা বোধ হয় সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। তাহাতে আবার অদূরস্থ আরণ্য জন্তুগণের ভীষণ নিনাদে, কর্ণকুহর বধির ও সর্ব্বশরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সম্মুখস্থ একটী ঝাউ বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইলে, মনে মনে এই আলোচনা করিলাম, যে উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, সে উদ্দেশ্য সাধন জন্য, কত দূরদেশে গমন, কত ভীষণ স্থান পর্য্যটন করিতে হইবে; কিন্তু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, গ্রাম পরিত্যাগ করিতে না করিতে, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। অতএব এখন হইতে আমাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইবে; হয়ত ক্রমাগত ২।৩ দিন কেবলমাত্র বায়ু ও সুবিধামত নির্ঝরবারি পান করিয়াই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইবে। হয়ত কতশত হিংস্র জন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্যে, রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। অতএব অদ্য হইতে,

সাহসকে শরীর রক্ষী সেনাপতি, দীনের গতি দীন-নাথের ভক্তিকে মূলধন ও হরিনামামৃত উপাদেয় পানীয়, এই মাত্র পথের সম্বল করিলাম। বারান্তরে মনে উদয় হইল—হয়ত পরম পিতা পরমেশ্বর আমাকে সংসার মায়ায় মোহিত করিয়া, পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করাইবার জন্য, প্রথমেই ঈদৃশ সঙ্কটে নিক্ষেপ করিয়া, মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিতেছেন; কিম্বা পূর্ব্বকালে যেমন সহমরণেচ্ছু সতিগণ, সহমরণোদ্যতা হইলে, প্রথমে তাহাদের এক অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সহিষ্ণুতা শক্তির পরীক্ষা করা হইত, তদ্রূপ আমাকে আজীবন অনন্ত কষ্ট ও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই বুঝি, জগৎপাতা জগদীশ্বর ঈদৃশ শঙ্কটে নিক্ষেপ করিয়া আমার সহিষ্ণুতা-শক্তির পরীক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক আর আমি সংসারের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মাকে কলুষিত করিব না। এই ভাবিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট মনোরথ পূরণোদ্দেশে প্রার্থনা করিবার জন্য উর্দ্ধমুখী হইলাম। মুদিতনেত্রে বহুক্ষণ উপাসনা করিয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র, অসংখ্য তারকাবলি পরিপূরিত, অনন্ত সুনীল নভোমণ্ডলের বিচিত্র শোভা, নেত্রোপরি পতিত হইল। বোধ হইল যেন, পরম কৃপাবান, ভগবান, সুবর্ণতারকারাজি ভূষিত নীলিম

চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া, স্বর্গীয় দেবতাগণের বহুদূর-ব্যাপী দৃষ্টি হইতে, পৃথিবীস্থ মানবগণের পাপ কার্য্যাদি দর্শনের পথ রোধ করিয়াছেন। সেই বিচিত্র চিত্রের প্রত্যেক চিত্রে, স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যের অসীম পরিচয় দৃষ্টে, মন ঐশ্বরিক প্রেমে মুগ্ধ হইল।

এতদিন মানবগণের কারুকার্য্য দর্শনে মুগ্ধ ছিলাম। এতদিন আগরা নগরীর তাজমহল, কলিকাতা নগরীর হাইকোর্ট বিলডিং, জেনারল পোষ্ট অফিস, রাইটার্স বিলডিং, রেলওয়ে অফিস ইত্যাদি দর্শন করিয়া, নয়নকে সার্থক জ্ঞান করিতাম, ও আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতাম; এতদিন হাবড়াব্রীজ, হুগলী-ব্রীজ, টেমস্‌নদীর সুড়ঙ্গ, বাবিলনের পুষ্পোদ্যান, ডেনমার্কের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতাম, ইউরোপীয়গণকে দেবতা সদৃশ মনে করিতাম, কিন্তু আজ বিশ্বপাতার বিশ্ববিজয়ী কারুকার্য্য দৃষ্টে, সে সকল তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। পরন্তু মনের ঘোর ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইল।

সৃষ্টি কর্ত্তার সৃজিত, অসীম গুণান্বিত, নানা রঙ্গে রঞ্জিত, বিনা ব্যয়ে গঠিত, অকৃত্রিম কারুকার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, অনিত্য কুদৃশ্য বস্তুকে সুদৃশ্য বলিয়া এতকাল মনে করিয়া ছিলাম, আত্ম গ্লানির

উদয় হইল। আহা! নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য্য দর্শনে, মনে মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আবার বোধ হইল, সুনীল নভোমণ্ডলের সুন্দর শোভা দর্শনে, ত্রিদিবস্থ দেবতাগণ বুঝি, ত্রিদিব ত্যাগ করিয়া, পৃথিবীস্থ মনুজগণের কার্য্যকলাপ দশন ও পাপ পুণ্যের বিচার করিবার জন্য, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণচন্দ্ররূপে, ও অপরাপর দেবতাগণ নক্ষত্ররূপে, গগনরূপ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; এবং জ্যোতির্ম্ময় ভগবান, চন্দ্ররশ্মি রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা, শস্যের সজীবতা, জলের শীতলতা, মানবগণের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া, সমস্ত পৃথিবীতে আপন অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

এ আবার কি! হঠাৎ পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল কেন? চন্দ্ররশ্মি সহসা তিরোহিত হইল কেন? ও! বুঝেছি! পাপভূমিতে পুণ্যাত্মা কতক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারেন? পৃথিবীর পাপ কার্য্য দর্শন করিয়া পুণ্যবান পূর্ণব্রহ্ম, আর পৃথিবীতে অবস্থান করিতে পারিলেন না। উঃ! এ কিসের শব্দ? কর্ণ যে বধির হইল; অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত কেন? দুষ্টের দমনকর্ত্তা পাপী দমন জন্য কি, পাপীর মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন! তাই নিশ্চয়! পাপিগণ,

এই রূপে অবিলম্বে পাপের ফলভোগ করে। বজ্রা-লোকে চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় আর ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে না পারিয়া মুখ নত করিলাম। তখন শ্যামল নব-দূর্ব্বাদল মণ্ডিত প্রকাণ্ড প্রান্তরের উপর দৃষ্টি নিপতিত হইল। আহা কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! একে শ্যাম-বর্ণের নবদূর্ব্বাদল সমভাবে সমস্ত স্থানে বিস্তৃত থাকিয়া প্রান্তরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহাতে আবার, প্রত্যেক দূর্ব্বাদলোপরি নিক্ষিপ্ত শিশির বিন্দুর উপর চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া, শ্যামা-ঙ্গিনী যুবতীর নাসিকা প্রান্তে চন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত নোলকের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বোধ হইল যেন, দর্পহারী ভগবান যৌবনমদে প্রমত্তা, সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা, স্বরূপে গর্ব্বিতা কামিনিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, এই সুদৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক ভাবে বহুক্ষণ উপবেশন করাতে অধিক কষ্ট হইতে লাগিল; কারণ অদ্যাপি আমার আত্মশাসন হয় নাই; কাজেই, দিক পরিবর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিলাম। সম্মুখে দেখিলাম, স্রোতস্বতী কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপর চন্দ্রকিরণ নিপতিত হইয়া, মরি মরি কি সুন্দর শোভাই সম্পা-দন করিয়াছে। বোধ হইল যেন, সোহাগিনী স্রোতস্বতী, স্বামীর সোহাগ ভোগ করিবার জন্য, স্বর্ণা-

লঙ্কারে বিভুষিতা হইয়া, পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজিকে আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য, মৃদুমন্দগতিতে গমন করিতেছে; এবং কখনবা নিশা শেষ হইল দেখিয়াই হউক, বা বিরহের আতিশয্য বশতঃই হউক, দ্রুত-গামিনী হইয়া গীতচ্ছলে মধুর কলধ্বনিতে সাগরাভি-মুখে গমন করিতেছে।

একি! এ আবার কি! এ নিবিড় হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বনমধ্যে এ কাহার বাসস্থান? ও! পূর্ব্বে যে শ্রবণ করিতাম, মুনিঋষিগণ অরণ্যে তপস্যা জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতেন, এ নিশ্চয়ই সেই ঋষিগণের পর্ণকুটীর! ঋষিগণের পর্ণকুটীর দৃষ্টে নিজের আবাসের বিষয় মনে হইল। তখন জন্মভূমির পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; সেই পরিচিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, যে সকল বৃক্ষে বাল্যকালে পক্ষিশাবক ধৃত করিবার জন্য আরোহণ করিতাম, সেই আত্মীয় বন্ধুগণের অট্টালিকা, যে অট্টালিকার উপর কতদিন ঘুঁড়ী উড়াইবার জন্য উঠিতাম, গ্রামমধ্যস্থ, সেই ক্রীড়াভুমি, যেখানে কত প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিতাম, সেই পাঠমন্দির, যেখানে বাল্যকালে পাঠাভ্যাস করিতাম ও শিক্ষক মহাশয়ের প্রহার ভয় পাঠাগারকে যমাগার স্বরূপ জ্ঞান করিতাম; বাটী থাকিলেও অব্যাহতি নাই, পিতার কঠোর শাসনে

নিয়ত সন্তপ্ত থাকিতে হইত এবং পাঠাভ্যাসে অবহেলা করিলে বিলক্ষণ প্রহারও সহ্য করিতে হইত। এই সময়ে স্নেহময়ী জননীর স্নেহের কথা মনে পড়িল। ক্রমে বাল্যকাল ছাড়িয়া কৈশোর তৎপরে যৌবন কালের কথা মনে পড়িল। এমন সময়ে, সহসা আমার হৃদ্‌পিণ্ডে মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় কিসের আকর্ষণ হইতে লাগিল।

সহসা সেই মুখ খানি—সেই গৌরবর্ণে চিত্রিত, পদ্মপত্রাকৃতি বদনোপরি পদ্মাক্ষি ভাসিত, এবং তন্মধ্যস্থ তিলফুল সমতুল নাসিকা পরিশোভিত, এবং তদগ্রে মণিময় নোলক পরিদোলিত ও তাম্বুলরসে সুঠাম ওষ্ঠাধর সুরঞ্জিত মুখখানি মনে পড়িল। তখন আমি সদসদ বিবেচনা বিহীন হইয়া কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া, কিছুই নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলাম, এবং যথেচ্ছা গমন করিতে লাগিলাম।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানবগণের দুষ্কর্ম্মের শাস্তি বিধানের নিমিত্ত, জগৎপাতা জগদীশ্বর কর্ত্তৃক যতগুলি উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চিন্তা একটি প্রধান উপায়। মানবগণ কোন অপরাধ করিলে, অর্থাৎ রাজার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিলে, অপরাধিগণকে, আধুনিক রাজনিয়মানুসারে কারাবাস ও বেত্রাঘাত প্রভৃতি শারীরিক ও আর্থিক দণ্ড ভোগ করিতে হয়; কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বরের দণ্ড সেরূপ নহে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য।

ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কোন কার্য্য করিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, মানবগণ যেরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, যদিও সেই সকল দণ্ড, রাজগণের কৃত প্রাগুক্ত প্রকার দণ্ড অপেক্ষা মনুষ্যগণকে শত সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা প্রদান করে, তথাপি মানবগণ তাহা ঈশ্বরের কৃত দণ্ড বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না। কারণ সেই সকল দণ্ড, দণ্ডদাতার দণ্ডাজ্ঞা সময়ের অনুমতির উপর নির্ভর করে না। পূর্ব্ব হইতে তাহার এমনি সংযোগ সংঘটিত থাকে যে মানবগণ কোন্ দুষ্কর্ম্মের কি দণ্ড তাহা কিছুই অনুভব করিতে

পারেন না। যন্ত্রণাদায়ক নানা প্রকার জ্বর বহুবিধ উদরাময়, অনেক প্রকার বেদনা, ইত্যাকার নানা জাতীয় পীড়া, ঈশ্বরের শাস্তি বিশেষ তাহায় আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল শাস্তি অপেক্ষা, ঈশ্বরের সৃজিত আর এক প্রকার অতি চমৎকার শাস্তি আছে। যেমন আধুনিক রাজগণ, কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হইলে, তাঁহার জন্য অনধিক অপমান জনক এবং অনায়াসসাধ্য নূতন প্রকারের শাস্তি বিধান করেন পরম পিতা পরমেশ্বর বুঝি, সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ও উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের দুষ্কৃতির শাস্তি বিধান জন্য, সেইরূপ অনায়াস সাধ্য সেই শাস্তির সৃজন করিয়াছেন তাহার নাম চিন্তা। চিন্তা যে কিরূপ শাস্তি, তাহা বোধ হয় আমার আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সকলই, বিশেষতঃ উচ্চপদাভিষিক্ত ধনাঢ্য ও ভূস্বামীবর্গ, বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। কি অপরাধে যে, আমি জগদীশ্বরের এই চিন্তা দণ্ডে দণ্ডিত হইলাম, তাহা কেমনে বুঝিব?

পূর্ব্ব বর্ণিত বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া, চিন্তা দণ্ড ভোগ করিতে করিতে কোন্ দিকে কত দূর গমন করিয়াছি, তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না।

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, কেবল চিন্তাদণ্ড সম্ভোগ করিতে করিতে গমন করিতেছি, অকস্মাৎ সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ শব্দ প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন আমি চিন্তাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলাম, এবং ক্রন্দন শব্দানুসারে, সেই দিকে গমন করিতেছি, এমন সময়ে নদীজলে কোন গুরুভার দ্রব্য পতনের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিলাম। তৎ পরক্ষণেই, হা পাপীয়সি! হা হতভাগিনি! হা কুলকলঙ্কিনি! কি করিলি? সর্ব্বনাশ করিলি? পুত্র হত্যা করিলি? যে কুকর্ম্ম অপেক্ষা আর কুকর্ম্ম নাই, যে অপরাধের মার্জ্জনা নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই জীব হত্যা পুত্র হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া আত্মাকে কলুষিত করিলি? এই কি তোর সচ্চরিত্রতা? এই কি তোর ধার্ম্মিকতা? এই কি তোর বৈধব্য ব্রতের পরিণাম? তুই না কুলীন বিধবা রমণী? তুই না হবিষ্যান্ন ভোজী হিন্দু বিধবা? তাই বুঝি, সদ্যপ্রসূত সুন্দর শিশুকে, নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া বৈধব্য ব্রতের ও সচ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলি! কাজ কি তোর ধর্ম্মে, কাজ কি তোর সমাজে, কাজ কি তোর লোকনিন্দা ভয়ে এ পুত্র হত্যা পাপে কলুষিত হওয়া অপেক্ষা, সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরকাল

বনবাসিনী হওয়া তোর পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। তাহা হইলে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত। এইরূপ বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি অষ্টাদশ কি ঊনবিংশতি বর্ষীয়া রমণী। রমণীর পরিচ্ছদ দৃষ্টে বোধ হইল তিনি হিন্দু বিধবা; ও অপরটী অনুমান অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কিন্তু বৃদ্ধ হওয়াতেও তাঁহার শরীর বিরূপ বা রূপলাবণ্য তিরোহিত হয় নাই। বৃদ্ধের শরীরের আয়তন, নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ, এবং শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গৌরবর্ণে রঞ্জিত ও সুগঠিত; আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু দুইটীতে বদন মণ্ডলের লোকাতীত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। পরন্তু চক্ষুদ্বয় এমনই তেজঃব্যঞ্জক যে মানব চক্ষে কখনই সেরূপ তেজঃ সম্ভবিতে পারে না। খগরাজের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই যেন, বিধাতা তাঁহার অতুল নাসিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগ, কিম্বা অন্য কোন রক্তবর্ণে রঞ্জিত না হইলেও, স্বাভাবিক এমনই সুন্দর বর্ণে চিত্রিত, যে জগতে এমন কোন বর্ণ নাই যে, তাহার উপমা হইতে পারে। শ্বেতশ্মশ্রু, বদনমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকিয়া, বদন মণ্ডলের সৌন্দর্য্যের প্রকাশ করিতেছে; প্রশস্ত ললাটে প্রগাঢ় বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে; পৃষ্ঠোপরি লম্বিত জটাজাল

দৃষ্টে কৈলাসপতি ভূতনাথ বলিয়া ভ্রম হয়। পরিধান কৌষিক বস্ত্র। ফলতঃ সর্ব্বাঙ্গ এমনই তেজঃব্যঞ্জক ও মূর্ত্তি এমনই প্রশান্ত যে, বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অভাগিনীকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য, মানব-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমি ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম দেব! ভবদীয় রূপ সন্দর্শনে মদীয় অন্তঃকরণ নিতান্ত অধীর হইয়াছে। আমার বোধ হইতেছে যেন ভূমণ্ডলের পাপভার অপনোদন করিবার জন্য, আপনি ত্রিদিব পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ত্রিদিববাসী না হইলে ভূমণ্ডলবাসিগণের কখন একাধারে সমস্ত সুলক্ষণ দৃষ্ট হয় না। অতএব, আর্য্য! যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কয়েকটী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান দ্বারা, অধীনের ঔৎসুক্য নিবারণ করতঃ কৃতার্থ করুন।

কেনই বা আপনি, এ ভদ্র মহিলাকে তিরস্কার করিতেছেন? কেনই বা ইনি, এরূপ নির্জ্জন বনপ্রদেশে সমাগতা হইয়াছেন? কি নিমিত্তই বা আপনি এস্থানে আগত হইয়াছেন? কেনই বা আমি, ইতঃপূর্ব্বে এ নির্জ্জন বন প্রদেশে সদ্যঃ প্রসূত বালকের ক্রন্দনের ন্যায় ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলাম? এবং কেনই বা,

নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেই বালকের উদ্দেশ না পাইলাম? আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, তিনি প্রণতি নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! বলিব কি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কণ্ঠ শুষ্ক হয়, রসনা স্বকার্য্য সাধনে বিরত হয়। বল্লালসেন কৃত, কৌলীন্য প্রথাই যত সর্ব্বনাশের মূল। কি কুক্ষণেই বল্লালসেন এই কুলক্রমাগত কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হে মহাত্মন্ বল্লালসেন! তুমি কি উদ্দেশ্যে এই কুল-ক্রমাগত কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলে তাহা কেমনে বলিব! কিন্তু তোমার সৃষ্ট কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গীয় সমাজের যে কি দুর্গতি হইতেছে, তাহা তুমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ না। একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার কৃত কৌলীন্য প্রথায়, বঙ্গীয় সমাজ কিরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছে। বঙ্গীয় অন্যান্য রাজগণের কীর্ত্তি দ্বারা, তাঁহাদের নাম অদ্যাপি বঙ্গে বিরাজমান রহিয়াছে বটে কিন্তু পরিণামে তাঁহাদের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের নামও বিলুপ্ত হইবার সম্ভব। কিন্তু তুমি বঙ্গীয় সমাজে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়াছ, তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না। যতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন বঙ্গে, একটি মাত্রও হিন্দু সন্তান বাস করিবে; ততদিন তোমার কীর্ত্তি বঙ্গে দেদীপ্যমান থাকিবে।

যদিও কালক্রমে বঙ্গদেশ, দুস্তর সাগর, নিবিড় অরণ্য, কিম্বা সুবিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হয়, তথাপি তোমার কীর্ত্তি, বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবে না। সাগরের স্রোতে, আরণ্য বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে, মরুভূমির মধ্যস্থ বায়ুর শন্ শন্ শব্দে, অনন্তকাল তোমার কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।

হে বঙ্গবাসিগণ। আর কতকাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? আর কতকাল তোমরা কুল গৌরব রক্ষা করিতে স্ত্রী, কন্যা ভগিনীদিগকে অনন্ত দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া দিবে? আর কতকাল তোমরা কৌলীন্য মর্য্যাদা মদে মত্ত হইয়া রমণী বধ করিবে? তোমাদের এ মোহনিদ্রার কি অন্ত নাই? এক পুরুষ, দুই পুরুষ, পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দশ পুরুষ গত হইল, তথাপি কি তোমাদের এ মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? এক বৎসর দুই বৎসর ক্রমে ক্রমে শত সহস্রাধিক বৎসর গত হইল, তথাপি কি তোমাদের এ কৌলীন্য মদমত্ততা অন্তর্হিত হইবে না? না! আর না!! যথেষ্ট হইয়াছে!!! একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন কর, একবার বঙ্গমাতার দিকে দৃষ্টিপাত কর, একবার অভাগিনী বঙ্গ রমণীগণের ক্রন্দনে কর্ণপাত কর; দেখ সমাজের কঠোর শাসনে, অবলা রমণীগণ কিরূপ মর্ম্মাহতা হইয়াছে। সুখ, দুঃখ সকল অবস্থাতেই

আছে; যন্ত্রণা সকলেই অনুভব করিতে পারে; পরম দয়ালু ন্যায়বান পরমেশ্বর, পুরুষগণের শরীর রক্তমাংসে ও রমণীগণের শরীর পাষাণে, কি লৌহে, কি তদপেক্ষা কঠিন পদার্থে নির্ম্মাণ করেন নাই। তোমরা ইচ্ছামত আহার বিহার কর, কিন্তু অভাগিনী রমণীগণকে, চিরকাল অপরাধিনীর ন্যায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা পরিণয়ের পূর্ব্বে, পাত্রীর বয়স, রূপ, গুণ বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটী কর না; কিন্তু অবলা রমণীগণের পরিণয়ের পূর্ব্বে তাহাদিগকে, এই সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, মৃত্যু শয্যাগত বৃদ্ধ হস্তে সমর্পণ করিবার সময়েও তাহাদের মতামতের উপর কিছু মাত্র নির্ভর কর না।

তোমাদের বিবাহিতা স্ত্রী, কুৎসিতা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জনকারিণী না হইলে, অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ব স্ত্রীকে চিরকাল নানামতে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে কিছু মাত্র পাপ মনে কর না; কিন্তু পরমা সুন্দরী অবলা যুবতী, তোমাদের কৌশলে কুৎসিত বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হইলে, অভাগিনী, তাহার চিরকালের আশা, চির-কালের সুখ, চিরকালের বাসনা, এক কালে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া মনোদুঃখে একদিন স্বামীর সহিত

তাদৃশ আলাপ না করিলে, তাহাকে পাপিয়সী বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন কর। তোমাদের পরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে দুই দিন কালও বিলম্ব কর না, কিন্তু হতভাগিনী রমণীগণ বিধবা হইলে, আজীবন তাহাদিগকে বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ কর। এক সন্ধ্যা হবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়া তাহাদের শরীর শীর্ণ কর, বসন ভূষণ জন্মের মত তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ কর, হায়! হায়!! কি অন্যায়! কি অত্যাচার!! কি অরাজকতা!!!

রে কৌলীন্য মর্য্যাদা! তুই আর কতকাল এদেশে আধিপত্য প্রকাশ করিবি? রে সমাজের কঠোর শাসন! তুই আর কতকাল, অভাগিনী দুর্ব্বলা বঙ্গ রমণীগণকে শাসিতা করিবি? দূর হ! দূর হ!! দূর হ!!! শীঘ্র এদেশ হইতে দূর হ! তোদের জন্য, বঙ্গীয় রমণীগণের দুরবস্থার শেষ হইতে আর কিছু মাত্র বাকি নাই। তোদের জন্য বঙ্গমাতার পবিত্র অঙ্গে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত হইতে, আর বিন্দুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট নাই। দেশ ছারখার হইল! অবলা যুবতীগণের দুঃখাশ্রুতে, বিধবাগণের ক্রন্দনে, বঙ্গমাতার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়াছে; ভ্রূণ হত্যাপাপে বঙ্গ কলুষিতা হইয়াছে। হা বঙ্গীয় অবলাগণ! তোমরা আর কেন মুখ প্রকাশ কর? তোমরা আর কেন অশ্রুপাত

কর ? যে দেশে রমণীগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, যে দেশে অভাগিনী রমণীগণের দুঃখে দুঃখিত হইবার এক প্রাণীও নাই, সে দেশে থাকিলে কিছুতেই তোমাদের দুঃখ দূর হইবে না। অবলাগণকে কষ্ট প্রদান করা যাহাদের মানস, রমণীর প্রতি স্বেচ্ছাধীন ব্যবহার করা যাহাদের পদ্ধতি, রমণী বধ করা যাহাদের ব্রত, দুর্ব্বলার প্রতি বল প্রয়োগ করা যাহাদের মাহাত্ম্য, তাহাদের দ্বারা তোমাদের দুঃখ কি প্রকারে দূর হইতে পারে ? যে দেশের পুরুষের হিতাহিত জ্ঞান নাই, যে দেশের পুরুষের ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, সে দেশের পুরুষের দয়ার লেশ মাত্রও নাই, সে দেশে কেন তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ? আর কি আশায় বা আশ্বাসিতা হইয়া জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছ ? যখন অনুকরণ প্রিয় বঙ্গবাসিগণ, কি আহার, কি বিহার, কি পরিচ্ছদ সকল প্রকার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বিষয়ে বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া, বিদেশীয় উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বিবাহ বিষয়ে অনুকরণ করিতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতেছে, তখন তোমাদের দুঃখ আর কিছুতেই দূরীভূত হইবার নহে। হায়! হায়! এমন সুসভ্য বঙ্গদেশে, যে কেন এমন অনিষ্টকারী কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা কেমনে বুঝিব।

হায়! হায়!! কেন যে এমন বুদ্ধিমান বঙ্গবাসি-গণ, ধর্ম্মের মস্তকে, ন্যায়ের মস্তকে, পদাঘাত করিয়া, নৃশংস দেশাচারের দাস হইয়া, কৌলীন্য প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আসিতেছেন তাহা কেমনে জানিব। এই অনিষ্টকারী, অনর্থোৎপাদনকারী কৌলীন্য প্রথা কি রহিত হইবে না? ইহা চিরকাল কি বঙ্গদেশকে দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়া রাখিবে? হে বঙ্গবাসিগণ! কেন তোমরা স্ব স্ব ইচ্ছাক্রমে কৌলীন্য প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে দরিদ্রতাজালে জড়ীভূত, জন্ম-ভূমিকে দুঃখার্ণবে মগ্ন ও বঙ্গীয় রমণীগণকে অনন্ত দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দিতেছ? ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমরা যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত রাখিতে, এত যত্নবান হইতেছ, যে কুল গৌরব রক্ষা করিতে সর্ব্ব-স্বান্ত হইতেছ, যে কুলক্রিয়া সাধন করিতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা ও ভগিনীদিগকে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধহস্তে সমর্পণ করিতেও কিছুমাত্র দুঃখিত বা কুণ্ঠিত হইতেছ না, এবং একবার বিবাহ সময়ে অর্থ ব্যয় করিয়াও অব্যাহতি পাইতেছ না, জামাতার জীবন কাল পর্য্যন্ত আপন পরিবার বর্গকে বসন ভূষণ হইতে বঞ্চিত, এমন কি উদরান্নেরও কষ্ট প্রদান করিয়া যে কুলীন জামাতার মান রক্ষার্থে নানামতে উপঢৌকন দিতেছ, সে কুলীন জামাতা কি প্রকৃত

কুলীন লক্ষণাক্রান্ত? হয়ত সে কুলীন জামাতার কৌলীন্য নব সু লক্ষণের মধ্যে একটীও বিদ্যমান নাই। হয়ত সে কুলীন জামাতা, নবগুণে গুণান্বিত হওয়ার পরিবর্ত্তে নবাধিক দোষে দোষান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। আর সেই অজ্ঞানান্ধ মূর্খ ঘোর পাতকী বৃদ্ধ ব্যক্তিকে, আপনাদিগের সর্ব্বগুণান্বিতা, সুরূপ সংযুতা, যৌবন প্রমত্তা কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য, কত চেষ্টা, কত যত্ন করিতেছ; কত আয়াসই বা পাইতেছ; ও নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি এবং পরিবার বর্গের বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া কুলক্রিয়া সম্পাদন করিতেছ। আর বিবাহ কার্য্য সম্পাদনের পরে, উদরান্নের জন্য মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া আজীবন ঋণজালে জড়ীভূত থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ ও কুলীন জামাতার উপঢৌকন প্রদান করিতেছ। এবম্প্রকারে ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়া, নিজের কীর্ত্তিনাশ, পরকালের ধর্ম্মনাশ ও সন্তানগণের কারাবাসের কারণ হইতেছ। দেখ দেখি কি ভ্রান্তি! কি ভ্রান্তি!! কি মোহ! কি মোহ!!

দরিদ্র কুলীনের ঘরে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলে, পিতা মাতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। অনেকে হয়ত, কন্যাকে কুলীন হস্তে সমর্পণ করিবার উপযোগী অর্থ

সংগ্রহে অক্ষম হইয়া, বাৎসল্য পরিত্যাগ করিয়া, কন্যার আয়ু বৃদ্ধি কামনার পরিবর্ত্তে, মৃত্যু কামনা করেন। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি, অর্থের অপ্রতুলতা বশতঃ হয়ত কুলীন হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া, কুল গৌরব নাশের ভয়ে অকুলীনকে কন্যা দান না করিয়া কন্যাকে আজীবন কুমারী অবস্থায় কালক্ষেপণ করান; সুতরাং অভাগিনী যে ইন্দ্রিয়ের বশীভূতা হইয়া, কুপথে পদার্পণ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপে কন্যা, যতদিন পর্য্যন্ত অন্তঃস্বত্বা না হন, ততদিন পর্য্যন্ত পিতা মাতা, কন্যার ব্যভিচার দোষ গোপন করিয়া রাখেন; পরে কন্যা অন্তঃস্বত্বা হইলে, পিতা মাতা সমাজের ভয়ে, লোক নিন্দাভয়ে, ভ্রূণ হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। অনেক স্থলে ভ্রূণ হত্যা ও স্ত্রী হত্যা উভয় হত্যাই, এককালে সম্পাদিত হয়।

আর যে সকল লোক মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন, তাঁহারা নিজের বিষয় সম্পত্ত্যাদি বিক্রয় করিয়াও, মুর্খ যুবক কুলীনের উপযুক্ত পণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হয়েন। আবার এদিকে, মুর্খ কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে মান হ্রাস হইবার ভয়ে, অগত্যা শ্মশান শয্যাগত বৃদ্ধকে অর্থার্থে বশীভূত করিয়া, নিজ যুবতী কন্যার সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ

করেন। সে বৃদ্ধ, আর কতদিন কৌলীন্য গর্ব্ব প্রকাশ করিবে? কাল, কৌলীন্য গর্ব্বে ভীত হইবার নহে।

সুতরাং, তিনি, কালের করালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার অভাগিনী স্ত্রী ও আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী, হয়ত সৎপ্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া নিজের অনন্ত দুঃখাশ্রুতে বঙ্গমাতাকে প্লাবিত, নতুবা কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া ভ্রূণ হত্যা পাপে পৃথিবীকে কলঙ্কিতা করেন। আর যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সর্ব্ব প্রধান কুলীন চূড়ামণিগণকে কন্যা দান করেন। তাঁহাদের জামাতা যুবক শ্রেণী ভুক্ত হইলেও, কন্যার অদৃষ্টে সুখলাভ ঘটিয়া উঠে না। কারণ উক্ত জামাতা, হয়ত আরও শতাধিক ব্যক্তির জামাতা, সুতরাং অভাগিনীর ভাগ্যে স্বামীলাভ কিরূপে সুলভ হইবে? এইরূপে স্বামীলাভে বঞ্চিতা হইয়া, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য ব্যভিচার দোষে দূষিতা হইয়া, অন্তঃস্বত্বা হয়েন; কিন্তু এরূপ স্থলে ভ্রূণ হত্যার আশঙ্কা অতি অল্প থাকে। কারণ তাহার পিতা মাতা, অর্থবলে জামাতাকে বশীভূত করিয়া একবার আপন বাটীতে আনয়ন করিতে পারিলেই, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এইরূপ বঙ্গীয় সমাজ অঘোরঃ ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যা পাপে

কলুষিত হইতেছে। তাহা বঙ্গবাসীগণ, দেখিয়াও দেখেন না; কেবল মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া; সমাজের দুর্নীতির দাস হইয়া রহিয়াছেন। মহাশয়! বলিব কি সমাগতা রমণীও, এবম্প্রকার কুলীনা রমণী, বৃদ্ধ হস্তে পতিতা হইয়া পরিণয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হয়েন। কামেন্দ্রিয়ের পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিতা হইয়া, অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েন; পূর্ণ অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায়, গোপনে প্রসব মানসে এস্থানে সমাগত হইয়া একটী পুত্র প্রসব করেন। পরে সমাজের ভয়ে, লোক নিন্দার ভয়ে, সদ্যঃ প্রসূত শিশু সন্তানকে নদী জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব বর্ণিত বৃক্ষে, আরূঢ় অবস্থায়, জন্মভূমি দর্শন করিয়া, যদিও, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি পরিত্যাগের বাসনা, অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল যদিও পরমারাধ্য পিতা ও পরমারাধ্যা মাতার স্নেহ স্মৃতি পথারূঢ় হওয়ায়, হৃদয় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইতেছিল। যদিও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, প্রেমময়ী

প্রণয়িনীর বদন সুধাকর হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়ায়, অহোরহঃ সেই শরদিন্দু বিনিন্দিতার বদন সুধাপানে মন নিতান্ত আকৃষ্ট হইতেছিল, তথাপি সংসারাশ্রমী গণের পাপের, সমাজের অত্যাচারের, দেশীয় লোকের অবিচারের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, আর তিলমাত্র সময়ও জন্মভূমির সন্নিকটে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা জন্মিল না। জন্মভূমির মমতা, পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রেমময়ী প্রেয়সীর ভালবাসা, চির বিচ্ছেদানলে আহুতি দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কত কত গ্রাম, প্রান্তর, নদ, নদী পার হইয়া অবশেষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপে উপনীত হইলাম। প্রবাদ আছে পুরাকালে সগর বংশীয় রাজা ভগীরথ কর্ত্তৃক, এস্থানে গঙ্গা আনীত হইয়াছিলেন, এজন্য গঙ্গার এস্থান ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ। যদিও এক্ষণে নবদ্বীপের সে শোভা সমৃদ্ধি নাই, তথাপি নবদ্বীপ বঙ্গদেশের একটী প্রধান নগর মধ্যে পরিগণিত; যে সময়ে নবদ্বীপ, বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, সে সময়ে নবদ্বীপের গৌরবে সমস্ত বঙ্গভূমি গৌরবান্বিত ছিল। আমি যে সময়ে নবদ্বীপে উপনীত হইলাম তখন নিশানাথ প্রেয়সী নিশা দেবীর সহিত গগণ মার্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া, যেন বহুদিবের

বিচ্ছেদের পর প্রাণপ্রিয়ার দর্শন পাইয়া, সহাস্য বদনে প্রাণ পুরিয়া প্রেমালাপ করিতেছেন, এবং সেই হাস্যে সমস্ত নবদ্বীপ হাস্য করিতেছে। পার্শ্বস্থা ভাগীরথী, পতি সোহাগিনী নিশাদেবীকে সুখ সম্ভোগে নিযুক্তা দেখিয়া, নিজের সুখ উদ্দেশ্যে স্বামী-সোহাগ-ভোগ করিবার জন্য, দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কেবল বিদেশাগত-বিরহ-প্রপীড়িত পাপিয়া পক্ষী, নিশানাথের প্রেম সম্ভোগ দেখিয়া ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া, বৃক্ষডালে বসিয়া "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" শব্দে নিজের হিংসাবৃত্তি প্রকাশ করিতেছে।

এ সময়ে কোন গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণের আশা দুরাশা ভাবিয়া ভাগীরথী তীরবর্ত্তী একটী জীর্ণ মন্দিরের নিকটস্থ অশোক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলাম। আমি যেমন নবদ্বীপের শোভা সমৃদ্ধি দর্শন জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া দিবাগমের প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম, নিশানাথও তেমনই প্রেম সম্ভোগে অধৈর্য্য হইয়া রজনীর স্থায়ীত্ব প্রার্থনা করিতেছিলেন; এবং কখন বা প্রিয়া কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, মুখ ম্লান করিতেছিলেন, অমনি নিশানাথের দুঃখে সমস্ত নবদ্বীপও ম্লান হইতেছিল, পরক্ষণেই পুনরায় প্রণয়িণী কর্ত্তৃক প্রিয় সম্ভাষিত হইয়া, আবার হাস্য করিতেছেন; সেই হাস্যে নবদ্বীপও আবার

হাসিতেছে। নিশানাথের এই প্রেমরঙ্গ দেখিতে দেখিতে ও বিচ্ছেদ-কাতর হিংসাতুর পাপিয়ার সকরুণ "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে অশোক বৃক্ষমূল উপাধান স্থানীয় করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম।

হায়! পূর্ব্বে সংসারাশ্রমে থাকিয়া, সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যস্থ, পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যাশায়ী হইয়া, সুকোমল উপাধানে মস্তক সুরক্ষিত করিয়া, প্রিয়া কর্ত্তৃক ব্যজন দ্বারা গ্রীষ্মের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াও, নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তায় এক দিনও সুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারি নাই; কিন্তু অদ্য অনাবৃত ও অপরিষ্কৃত স্থানে ধূলি শয্যাশায়ী ও বন্ধুর বৃক্ষমূল উপাধান স্থানীয় করিয়া, শৃগাল, কুক্কুর ও মশক কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও সুনিদ্রার ক্রোড়ে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। এমন সুনিদ্রা আমি পূর্ব্বে একদিনও সম্ভোগ করিতে পারি নাই। কে বলে সংসারে সুখ আছে? কে বলে সংসারী লোক সুখী? যে বলে সে ঘোর ভ্রমান্ধ।

যখন দিননাথের আগমনের সময় বুঝিয়া, নিশা দেবী লজ্জাভরে স্বামী অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন, যখন নিশাকান্ত, নিতান্ত অনিচ্ছা পরতন্ত্রে প্রেয়সীর প্রেম সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া, বিরহে ক্রমে২

ম্লান হইয়া অস্তমিত হইলেন, যখন প্রাভাতিক শীতল বায়ু নিদ্রিত জীব জন্তুগণকে জাগরিত করিবার জন্য সুখদ হিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছিল, যখন পক্ষিগণ, পরম পিতা পরমেশ্বরের শিল্পনৈপুণ্যের ও সৃষ্টিরক্ষার এই অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় পাইয়া, স্ব স্ব ভাষায়, সেই বিশ্বপাতার স্তুতিপাঠ করিতেছিল, তখন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলাম, তখনও মরীচিমালী মার্ত্তণ্ড দেবের ময়ূখমালা ধরাতল স্পর্শ করে নাই। সম্মুখস্থ ভাগীরথীর ঘাট, বহুজন সমাকীর্ণ। নানা দেশীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ মনের আনন্দে গঙ্গা স্নান করিতেছে; কেহ বা গঙ্গা তীরে বসিয়া গঙ্গা মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিয়া, মনের মালিন্য দূর হইল মনে করিয়া, পরম পুলকিত হইতেছে; কেহ বা গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; কেহ কেহ তীরে বসিয়া তর্পণাদি করিতেছে; এমন সময়ে নিকটস্থ দেব মন্দিরের মধুর শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতে গঙ্গাবক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ধূপ ধূনার পবিত্র সৌরভে, চতুর্দ্দিক আমোদিত ও মানব মন পুলকিত করিতে লাগিল। মন্দিরস্থ সন্ন্যাসীগণের "হর হর ববম্ ববম্" শব্দে চতুর্দ্দিক স্তম্ভিত হইতে লাগিল। তখন আমার

মনের গতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা আর কি বলিব। হৃদয় যেন শান্তিপূর্ণ হইল।

যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই যেন শান্তি বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বদিনে যে মার্ত্তণ্ডদেব রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রখর কিরণবাণে জগৎ ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অদ্য সেই তপনের সে প্রখর তাপ নাই, শরীরের সে রক্তবর্ণ নাই, মূর্ত্তিতে সেরূপ প্রচণ্ডতা নাই। কল্য যে রক্তিম প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে, জীবজন্তুগণের মনের ভীতি উৎপাদিত হইয়াছিল, অদ্য শুভ্র ও সৌম্যমূর্ত্তিতে তাহাদের মনের পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা সম্পাদিত হইতেছে। কল্য যে প্রখর কিরণবাণ জগৎ ভস্মীভূত করিয়া জীব জন্তুগণের জীবন অপহরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল; অদ্য সেই রশ্মিজাল, জগতের, গাঢ় তিমিরান্ধকার দুরীভূত ও জীব জন্তুগণের দুঃখান্ধকার তিরোহিত করিয়া, তাহাদের মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার করিয়া দিতেছে। আবার এই অরুণের তরুণ কিরণ দেব মন্দিরে পতিত হওয়ায় মন্দিরটী যেন সুবর্ণ নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক, দেব মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গণভূমি পূর্ণ করিল। তখন আমি জনতা ভেদ করিয়া, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিলাম।

নিবিষ্ট চিত্তে, বহুক্ষণ আরাধনা করিয়া বহির্গত হইলাম। তখন আর তাদৃশী জনতা দৃষ্টি গোচর হইল না। কেবল দুই একটি যোগী মৃগ চর্ম্মে উপবেশন করিয়া মুদিত নেত্রে উপাসনা করিতেছেন। যদিও এই সাধু সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমনে আমার আর ইচ্ছা হইল না, কিন্তু নবদ্বীপের সমগ্র স্থান দর্শন লালসা এত বলবতী হইয়াছিল যে, অন্যত্র গমনের অনিচ্ছা, তাহার কোন প্রতিবন্ধকতা সাধন করিতে সমর্থ হইল না। ঔৎসুক্য পথপ্রদর্শক হইয়া আমাকে সমস্ত নবদ্বীপ দর্শন করাইল। নবদ্বীপ দর্শনে যেরূপ সুখনীরে অভিষিক্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ভাগ্য দোষে তাহার কিছুই সংঘটিত হইল না। পরন্তু বিষম দুঃখার্ণবে মগ্ন হইলাম। হায়! হায়!! নবদ্বীপের সে শোভা, সে সমৃদ্ধি কিছুই নাই; যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। পুরাকালে নবদ্বীপের যে সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ, মস্তক উত্তোলন করিয়া সমস্ত পৃথিবী মধ্যে নবদ্বীপের মহিমা ও নিজ নিজ সৌন্দর্য্যের গৌরব প্রচার করিত, এক্ষণে সেই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের মধ্যে কেহ কেহ যেন, নবদ্বীপের দুরবস্থা দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া ভগ্ন মস্তক হইয়া রহিয়াছে; কেহ কেহ যেন, নবদ্বীপের শোভা

সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের শোভা সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইল দেখিয়া অভিমানে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ যেন, নবদ্বীপের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে দেখিয়া শোকে, দুঃখে, অভিমানে আপন শরীর পরিত্যাগ করিয়া, স্তূপাকার ইষ্টকরাশি রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, নব কিশলয় দল ও নধর পল্লবে সুশোভিত হইয়া শাখা প্রশাখা ও পল্লব মধ্যস্থ নানাবিধ বিহঙ্গগণের মধুর কুজন ধ্বনিতে মুখরিত থাকিত ও সুশীতল বায়ু-হিল্লোল-ব্যজন দ্বারা পাদদেশ সর্ব্বদা স্নিগ্ধ ও শীতল রাখিয়া, প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে মানবগণ দ্বারা পরিপূরিত থাকিত, এক্ষণে সেই সকল বৃক্ষ, পত্রপল্লববিহীন ও ভগ্নশাখ হইয়া কোটর মধ্যস্থ পেচকের কর্কশ-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত ও প্রখর সূর্য্য কিরণে তলভূমি মরুভূমিবৎ উত্তপ্ত ও জন মানব বিহীন হইয়া কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে নবদ্বীপ বহুবিধ সুরম্য হর্ম্মে পরিশোভিত হইয়া অধিবাসীগণের আনন্দসূচক ধ্বনিতে সদা সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত থাকিত, এক্ষণে সেই নবদ্বীপ ভগ্নাবশেষাবস্থায় পতিত ও অধিবাসীগণের দুঃখজনক শব্দে পরিপুরিত রহিয়াছে। হায়! হায়!! হিন্দু রাজত্বের

সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, নবদ্বীপের শোভা সমৃদ্ধি নবদ্বীপবাসীগণের সুখ সচ্ছন্দতা সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে।

এক সময়ে, এই নবদ্বীপে মহাপ্রভু চিন্ময় সনাতন চৈতন্য দেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন মহিমা বলে নবদ্বীপও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকল আনন্দময় করিয়া তুলিয়া গিয়াছেন। তখন দরিদ্রতা দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিল, অশান্তি একেবারে দূরীকৃত হইয়াছিল, অরাজকতা, কি সাংসারিক কষ্ট কাহাকে বলে, দেশের লোক তাহার কিছু মাত্র অবগত ছিল না। কাহারও মনে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। কাহারও মনের অনুতাপের কিম্বা কোন প্রকার কষ্টের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিতে পারিত না, সকলেরই মন পবিত্রতা পুর্ণ ছিল, সকলেই পরমানন্দে সময়াতিপাত করিত, সকলেই স্বর্গীয় ভাবে স্বাধীনতা পথে বিচরণ করিত। সকলেরই জীবনে যেন কোন এক মহান্ উদ্দেশ্য ছিল, সকলেরই জীবনের লক্ষ্য, সেই মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হইত।

সকলেই যেন স্বর্গীয় সুখে, স্বর্গীয়ভাবে স্বর্গরাজ্য তুল্য নবদ্বীপে অবস্থিতি করিত। যখন কোন দেশ উন্নতি লাভ করে, যখন কোন দেশবাসীগণের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, যখন কোন দেশে ঈশ্বরানুগ্রহ পতিত

হয়, তখন একজন ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ তদ্দেশে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ তদ্দেশবাসীগণের নেতা হইয়া, জীবনের একমাত্র সুখময় লক্ষ্য দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতি সোপানে আরোহণ করান। নবদ্বীপের পুণ্য বলে নবদ্বীপ বাসীগণের শুভাদৃষ্টগুণে, নবদ্বীপে মহাপুরুষ চৈতন্য দেব জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত নবদ্বীপবাসীগণের নেতা হইয়া, তাহাদিগকে তাঁহার নিজের জীবনের সেই আনন্দময় উদ্দেশ্য, সুখ শান্তিপূর্ণ, স্বর্গ তুল্য রাজ্য দেখাইয়া, সকলকে একতা সূত্রে আবদ্ধ রাখিয়া, স্বর্গ সুখ ভোগ করাইয়া গিয়াছেন।

এই পুণ্য বলেই, সেন বংশীয় বীরসেন; মাধব সেন, বল্লাল সেন প্রভৃতি নরপতিগণ, নবদ্বীপের সিংহাসনারূঢ় হইয়া পরম্পরায় পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া স্বাধীনভাবে কেমন সুখ স্বচ্ছন্দে প্রজা পালন করিয়া গিয়াছেন। তখন নবদ্বীপবাসীগণের সুখের আর ইয়ত্তা ছিল না, ঐশ্বর্য্যের আর সীমা ছিল না, উন্নতির আর উচ্চ পদবী ছিল না, বোধ হয় তৎকালে সুরবাসিগণ, নবদ্বীপ বাসিগণের সুখ সৌভাগ্য দেখিলে আপনাদিগকে অধিক সুখী বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

আর যখন কোন দেশ উৎখাত হইবার উপক্রম হয়, যখন কোন দেশবাসিগণের অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন

তদ্দেশ বাসিগণের উপর ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি পতিত হইয়া, সেই দেশের প্রধান বংশে কোন এক মন্দ ভাগ্য দুর্ম্মতি জন্ম গ্রহণ করিয়া, নিজকৃত কার্য্যদোষে দেশ উৎখাত করে, দেশীয় লোক সকলের সুখ সচ্ছ-ন্দতা বিনষ্ট করে, ধন সম্পদ অন্তর্হিত করে, শান্তিকে জন্মের মত দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। অহ-র্নিশ কেবল হাহাকার রবে দেশ পরিপূর্ণ থাকে। তখন তদ্দেশ বাসিগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন যে, ন্যায়বান পরমেশ্বর, তাহাদের অন্যায় কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে এই নরকতুল্য যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, নবদ্বী-পের ভাগ্য দোষে, নবদ্বীপ বাসিগণের দুষ্কৃতির ফলে, সেন বংশীয় লাক্ষ্মণেয়, এই নবদ্বীপের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুগণের চির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছেন; সুখ সচ্ছন্দতা একেবারে জন্মের মত অন্তর্হিত করিয়া গিয়াছেন; ধন সম্পদ চির-কালের মত বিদায় দিয়াছেন; যেদিন সম্রাট কুতবুদ্দিন, বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ, ম্লেচ্ছাধম বখতিয়ার খিলজীকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন, যে দিন বখতিয়ার খিলজী, কেবল মাত্র অষ্টাদশ জন সেনা সমভিব্যা-হারে, বঙ্গদেশ জয় জন্য নবদ্বীপে প্রবিষ্ট হন, যে দিন দুর্ম্মতি ভীরু রাজকুলকলঙ্ক লাক্ষ্মণেয়, অল্প সংখ্যক

মুসলমানের ভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায়, দণ্ডিত অপরাধীর ন্যায়, শৃগালের ন্যায়, আপন রাজ্য, রাজ সিংহাসন, প্রজাগণের ধন, প্রাণ, সম্ভ্রম রক্ষার ভার পরিত্যাগ করিয়া, নৌকারোহণে গোপনে পলায়ন করেন, সে দিন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, দয়া মমতা বিহীন মুসলমানগণ, বঙ্গ প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও জীবন নষ্ট করিয়া বিনা যুদ্ধে শূন্য বঙ্গ সিংহাসন অধিকার করিয়াছে; সেই দিন হইতে— সেই দুর্দ্দিন হইতেই, লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের,—নবদ্বীপের কি, সমস্ত ভারতের স্বাধীনতা পলায়ন করিয়াছে। সেই দিন হইতেই অনার্য্য মুসলমান জাতির সঙ্গে সঙ্গে, দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে; সেই দিন হইতেই বঙ্গবাসিগণের সুখ সূর্য্য চিরকালের মত অস্তমিত হইয়াছে। ভাগ্যে ন্যায়পরায়ণ, প্রজারঞ্জনপ্রিয়, সুসভ্য ইংরাজ জাতি, বাণিজ্য উদ্দেশে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া, অসভ্য অত্যাচারী মুসলমানগণের হস্ত হইতে ভারত সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, নচেৎ এত দিনও দুর্ব্বল, কাপুরুষ, ভীরু, শৃগালের ন্যায় পলায়ন পর-বঙ্গবাসিগণ, মুসলমানের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। হায়! হায়!! নির্দ্দয়, নির্ম্মম, নৃশংস জাতি সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়া, ধনমদে

প্রমত্ত থাকিয়া; রাজনীতি সম্বন্ধে, কি কু-প্রথা অবলম্বন না করিয়াছেন? কি কু-কার্য্য না সম্পাদন করিয়াছেন? দেশ লুণ্ঠন, গ্রাম ভস্মীকরণ, নিরপরাধে বিবিধ যন্ত্রণা দায়ক প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাগণের প্রাণ নাশ, ধর্ম্মনাশ ইত্যাদি নানা প্রকার অত্যাচার দ্বারা, দেশ ছারখার করিয়াছেন। এমন কি দুরাত্মাগণ পিতামাতার সম্মুখে শিশু সন্তানের প্রাণ নাশ, পতির সম্মুখে সতী স্ত্রীর অবমাননা করিতেও ত্রুটি করে নাই। এত দুঃখ, এত অপমান যে, বঙ্গবাসিগণ সহ্য করিয়াছেন, সে কেবল শৃগালের ন্যায় পলায়ন-পর লক্ষ্মণ সেনের কাপুরুষতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে; সে কেবল দুর্ব্বল বঙ্গবাসিগণের মনে, স্বাধীনতা ও তেজের অভাব হওয়া ভিন্ন, আর কিছুই নহে, সে কেবল চাকরী প্রত্যাশী, বাঙ্গালীগণের চাকরী ভিন্ন জীবনের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই ইহা মনের ধারণা থাকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হা নবদ্বীপ! তুমি কেন এমন কুলাঙ্গারকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলে? কেন এমন, কাপুরুষ, নিস্তেজ, ভীরু লক্ষ্মণসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলে? এবং কেনই বা, মুসলমান বঙ্গে আগমনের পুর্ব্বে তাহাকে নিপাত না করিয়াছিলে? সেই কুলাঙ্গারের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা

দোষে তোমার এক্ষণে এই দুর্দ্দশা; তোমার সন্তান-গণের এক্ষণে এত কষ্ট; আর চক্ষে দেখা যায় না, আর সহ্য হয় না। বিবিধ সুরম্য হর্ম্ম্যরাজীর পরিবর্ত্তে স্তুপাকার ইষ্টকরাশি, বালক বালিকাগণের বদনে আনন্দময় অস্ফুট মধুরধ্বনির পরিবর্ত্তে, অনাহারে করুণ ক্রন্দন; যুবকগণের পারিপাট্য ও চাকচিক্য সম্পন্ন বসন ভূষণের পরিবর্ত্তে, মলিন দুর্গন্ধ ছিন্নবসন; যুবতীগণের চিক্কণ চিকুর বিন্যাসযুক্ত কবরীর পরিবর্ত্তে, আলুলায়িত কেশ; বৃদ্ধগণের বদনমণ্ডলে হরিনামের পরিবর্ত্তে, কেবল বিলাপসূচকধ্বনি, সমস্ত নবদ্বীপ দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। যদি কখন নবদ্বীপবাসি-গণের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, যদি কখন নবদ্বীপের উপর ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়, যদি কখন নবদ্বীপের সুখ-সূর্য্য উদিত হয়, যদি কখন নবদ্বীপ হইতে হাহা-কার বিদূরিত হয়, তবেই এস্থলে পুনরাগমন করিব; নচেৎ এই শেষ, এই বলিয়া আমি নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিলাম।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চৈত্র মাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল; তপনের প্রখরতাপে জগৎ দগ্ধীভূত হইতেছে। সূর্য্যদেব যেন, পৃথিবীর সহিত বিবাদ করিয়া মেঘনাদের ন্যায়, শূন্য-পথে থাকিয়া প্রখর কিরণবাণ বর্ষণে পৃথ্বীতল বিদীর্ণ করিতেছেন; তাহাতে মৃত্তিকা সকল, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মানবের কি সাধ্য যে, এই সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হয়! পশু পক্ষিগণও আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন আবাসে অবস্থিতি করিতেছে। যেদিকে দৃষ্টি-পাত কর, সেইদিকেই দেখিবে, কেবল প্রচণ্ড রৌদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতেছে; এবং কখন কখন বা, প্রিয় সহচর "লূ" নামক প্রাণনাশক বায়ুর সহিত যোগ দিয়া, সাক্ষাৎ কৃতান্তদূতের ন্যায় পৃথ্বীতলে বিচরণ করিতেছে। পথে বৃক্ষাদি অধিক নাই। কেবল স্থানে স্থানে দুই একটী বৃক্ষ দাবানল-দগ্ধ-পাদপের ন্যায়, পল্লব-পত্র-বিহীন হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন, ঈশ্বরের কোপানলে এদেশ অদ্যই ভস্মীভূত হইবে! এইরূপ প্রচণ্ড সময়ে, সেইস্থান দিয়া

একটী যোগীপুরুষ গমন করিতেছিলেন। তপনের প্রখর আতপ নিবারণের জন্য, তাঁহার মস্তকে ঈশ্বর প্রদত্ত দীর্ঘ কেশপাশ সংযুক্ত জটাজাল ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিষাক্ত প্রাণনাশক “লু” নামক বায়ুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত ভিন্ন অন্য কোন আস্তরণে আবৃত নাই। ঘূর্ণীবায়ু দ্বারা উত্থিত উত্তপ্ত বালুকারাশি হইতে নয়নদ্বয় রক্ষা জন্য নয়নোপরি চন্দনের প্রলেপ ভিন্ন, অন্য কোন পদার্থে নয়নদ্বয় আবৃত নাই। অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপর বিচরণ জন্য, পদদ্বয় স্বাভাবিক চর্ম্মে আবৃত ভিন্ন অন্য কোন আবরণ দ্বারা আবৃত নহে। পরিধেয় ব্যাঘ্র চর্ম্ম, হস্তে একটী দীর্ঘ লৌহশলাকা। যোগীবর উত্তপ্ত বালুকা, প্রচণ্ড রৌদ্র, বিষাক্ত “লু” বায়ু উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে সেইস্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সূর্য্যোদয়ে পৃথিবীর অন্ধকার তিরোহিত হয়, যেমন মেঘজালে সূর্য্য আচ্ছাদন করিলে, দিবাকরের প্রখর কিরণ অন্তর্হিত হয়, যেমন বারি পতনে প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তেমনই যোগীবরের আগমনে মৃত্তিকার উত্তপ্ততা, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণের প্রখরতা, “লু” বায়ুর বিষাক্ততা সমস্তই সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিম্বা যেমন, প্রাণ নাশকারী গরল পান করিয়াও, নীলকণ্ঠের জীবন নষ্ট

হয় নাই; প্রজ্বলিত অগ্নিতে, নিক্ষিপ্ত হইয়াও প্রহ্লাদের জীবন নষ্ট, কিম্বা দেহ দগ্ধ হয় নাই, তেমনই উত্তপ্ত বালুকা, প্রাণনাশক "লু" বায়ু ও প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে যোগীবরের কোনও অনিষ্ট সম্পাদন, কিম্বা শারীরিক কষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। সেই ধাম্মিকপ্রবর মধ্যাহ্ন-ভাস্করাপেক্ষা তেজঃপুঞ্জশালী যোগীবরের তেজঃ-ব্যঞ্জক-প্রচণ্ড-মূর্ত্তি দর্শনে, সন্ধ্যাকালের বৃদ্ধ তপন যেন নিস্তেজ হইয়া, ক্রোধে রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইলেন। মলয় পবন, মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী শীতল ও দিবাভাগের প্রচণ্ড তপন তাপিত জীব জন্তুগণের মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া নক্ষত্র, গগণমার্গে উদিত হইয়া আকাশ পরি-পূর্ণ করিল। নিশাকরের স্নিগ্ধ করবর্ষণে পৃথিবী শীতল হইল। যেমন শীত ঋতুর আগমনে, দুরন্ত শীতের ভয়ে বিষধর ফণী সকল বিবর মধ্যে অবস্থিতি করে, আবার বসন্তাগমে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতে দেখিয়া বিবর পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয়, সেইরূপ জীব জন্তু-সকলও সমস্ত দিবাভাগ প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কিরণের ভয়ে আপনাপন আবাসে অবস্থিতি করিয়া, এখন চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া, নিজ নিজ আবাস

হইতে বহির্গত হইয়া আপন আপন কার্য্যে মনো-
নিবেশ করিতে লাগিল।

আজ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী, অন্নপূর্ণা পূজা; সমস্ত
কাশীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; আনন্দোৎ-
সবে কাশীধাম পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহার যাহাতে
আনন্দোদয় হয়, সে সেই উৎসবে মত্ত আছে। যেমন
পুরাকালে ক্ষত্রবংশীয় রাজগণ, কোন যুদ্ধে জয়লাভ
করিলে, সকলেই একদিন এমন এক নূতন উৎসবে
প্রমত্ত হইয়া বিমল আনন্দানুভব করিত যে, সেদিন
কাহারও মনে দুঃখের লেশমাত্র থাকিত না, কাহারও
মনে অভিমান কিম্বা অহঙ্কারের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিতে
পারিত না, কাহারও মধ্যে উচ্চ নীচ কিম্বা কোন
প্রকার ভেদাভেদ দৃষ্ট হইত না, সকলেই একতা-সূত্রে
আবদ্ধ হইয়া, নিজ নিজ অভিলষিত সুখ ভোগ করিত,
কেহ তাহার কোন বাধা জন্মাইত না, পরন্তু একের
বিমল আনন্দে অন্যে যোগদান করিয়া সকলেই বিমল
সুখ ভোগ করিত। স্বাধীনতার যে, কি বিমল সুখ,
তাহা তাহারা সেই দিনই কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব
করিতে সমর্থ হইত। আজ কাশীধাম ঠিক সেইরূপ
আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ। কাশীর সমস্ত পথ ঘাট,
পল্লব-পুষ্প-সুশোভিত। অসংখ্য অসংখ্য পতাকা,
গগণমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর

মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অধিবাসিগণের সকলেরই গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত রহিয়াছে। সকলেরই বাটী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নানাপ্রকার বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া, যেন দেশের মঙ্গলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছে। দেববাটীর ত আর কথাই নাই। সমস্ত দেবমন্দির সুবর্ণমণ্ডিত; তন্মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য বহুমূল্য প্রস্তর, হীরক, মুক্তা, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি সকল, যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় মন্দিরের কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদিত হইয়াছে! কি বিমল জ্যোতিই বিকীর্ণ হইতেছে! বোধ হয় যেন সুবর্ণ নির্ম্মিত উদয়াচলে সহস্র সহস্র সূর্য্য উদিত হইয়া, সেস্থান আলোকিত করিয়াছে। না, না, তা নয়! আমার উপমার ভ্রম হইয়াছে! দেবমন্দিরের সে সুন্দর দৃশ্যের নিকট উদয়াচলের এ দৃশ্য অতি সামান্য। সূর্য্যের কিরণ আছে সত্য কিন্তু সূর্য্য সেরূপ মনোহর ও নয়ন তৃপ্তিকর জ্যোতিঃ কোথায় পাইবে? সহস্র সূর্য্যের উদয় সম্ভাবিত হইলেও উহাদিগের আলোক একই প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণেরও ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব; তাহারা সকলেই উষ্ণগুণ সম্পন্ন। কিন্তু দেবমন্দিরস্থ রত্নরাজীর রশ্মি ত সেরূপ নহে। কোন মণি হইতে নীল আভা, কোন মণি হইতে রক্ত আভা, কোন মণি

হইতে পীত আভা নিঃসৃত হইতেছে ; এবং আরও অনেকানেক মণি হইতে, এমন অপরূপ দীপ্তি নিঃসৃত হইতেছে যে, সে বর্ণ নয়ন কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই। জগতের সমুদয় মূল ও মিশ্রবর্ণ, পরস্পর পৃথক পৃথকরূপে মিশ্রিত ও পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত বর্ণ একত্রে মিশ্রিত হইলেও, সে বর্ণ উৎপাদিত হইতে পারে না। এতকাল কত কত কবির কাব্য পাঠ করিয়া, তাঁহাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাইয়াছি ; রূপ লাবণ্য বর্ণনার সময়, মানস চক্ষে, নায়ককে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়াছি ; কিন্তু এ প্রকার বিচিত্র বর্ণ, কখন দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কল্পনার কি সাধ্য যে, সে অপরূপ বর্ণ মনে ধারণা করিয়া আনয়ন করে ; লেখনীর কি সাধ্য যে, কোন প্রকারে সে বর্ণের উল্লেখ করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যের, তাহার বিমল জ্যোতির, শতাংশের একাংশও পাঠক পাঠিকাগণের মানসচক্ষে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের প্রত্যেক প্রস্তরের এক একটীর জ্যোতি, এক এক গুণ বিশিষ্ট। কেহ বা শৈত্য, কেহ বা নাতিশীতোষ্ণ, কেহ বা উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু এ উষ্ণতা সে উষ্ণতা নহে ; মানব শরীরে জ্বরের সঞ্চার হইলে, তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিলে, যে উষ্ণতায় গাত্র শিহরিয়া উঠে, এ উষ্ণতা সে উষ্ণতা নহে ; প্রখর-সূর্য্য

কিরণে শরীর উত্তপ্ত হইলে, যে উষ্ণতা দূর করিবার জন্য গাত্রে শীতল জল প্রদানের ইচ্ছা জন্মে; এ উষ্ণতা সে উষ্ণতা নহে; প্রজ্বলিত অগ্নিতে, পরিপক্ক তৈলে হস্ত প্রদান করিলে যে উষ্ণতা বোধ হয়, এ উষ্ণতা সে উষ্ণতা নহে; এ এক নূতন প্রকারের নূতন ধরণের উষ্ণতা। এ উষ্ণতা, কি প্রকারে পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ঙ্গম করাইব, তাহাই, এক্ষণে আমার একমাত্র চিন্তা। কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া, পদে পদে কল্পনার অতীত, লেখনীর অসাধ্য বলিলে, বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে অব্যাহতি দিবেন না। একবার ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া, পাঠক পাঠিকাগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছি; কিন্তু এবার তাহা হইবে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, শীতকালের রজনীতে, আহারাদির পর সুকোমল শয্যাশায়ী হইয়া শীতবস্ত্র দ্বারা, গাত্র আচ্ছাদন করিবার ক্ষণকাল পরেই যেরূপ উষ্ণতা বোধ হয়, এ সেই জাতীয় সুখময় উষ্ণতা; মুমূর্ষ অবস্থাপন্ন রোগীর সমস্ত শরীর শীতল হইলে, কোন ঔষধাদি দ্বারা তাহার শরীর উষ্ণ করিলে যে উষ্ণতা অনুভব করিয়া তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গ, সুখনীরে অভিষিক্ত হয়, এ সেই জাতীয় সুখকর উষ্ণতা। এ উষ্ণতায়, দেবমন্দিরের নিকটস্থ সমাগত সমস্ত ব্যক্তি,

সেই প্রকার সুখী হইতেছেন। আর কোন কোন প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরের কৃষ্ণ অঙ্গোপরি, নানাবিধ জ্যোতিঃ-বিশিষ্ট বহুমূল্য হীরক, মণি, মাণিক্য, সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। আ মরি! মরি!! তাহাতে মন্দিরের কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদিত হইয়াছে। পাঠক! তুমি কি একবার এ অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে ইচ্ছা কর? যদি ইচ্ছা হয়, তবে চল, যে আগ্রা নগরীতে, মোগল সম্রাট সাজিহান, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক, পৃথিবীস্থ সমস্ত বহুমূল্য রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া, জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পকরগণ দ্বারা, বহুকাল ব্যাপিয়া, ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, তাজমহল নামক এক প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন; যে তাজ-মহল, পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় হর্ম্ম্য ও প্রধান সুন্দর বলিয়া জগতে বিখ্যাত, সেই আগরা নগরীর তাজমহলে চল, যদি তথায় এরূপ সুদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। না! না! এ অপরূপ দৃশ্য, তথাকার তাজমহলেও দেখিতে পাইবে না, এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, এ দৃশ্য যেন জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি দ্বারা বিধাতা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে; এ দৃশ্যের সহিত মানব নির্ম্মিত কোন দৃশ্যের উপমা হইতে পারে না। পাঠক! তবে চল, একবার সেই বিশ্বস্রষ্টার সৃজিত সুন্দর বস্তুর অন্বেষণ করি, যাহাতে ইহার উপমা হইতে পারে। ঐ দেখ, এই

নিবিড় অন্ধকারময়ী রজনীতে, ঐ তটিনীতটে, খদ্যোৎ-কুল-পরিবৃত-বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, উহা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। উহা দেখিলে মনে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, ও মন ঐশ্বরিক প্রেমে মুগ্ধ হয়, সেই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত, নানাবিধ রত্নরাজি বিভুষিত, কাশীস্থ দেবমন্দির দর্শনেও, মনে সেইরূপ আনন্দোদয় হইবে ও মন ঐশ্বরিক প্রেমে মুগ্ধ হইবেক।

যখন, সমস্ত কাশীধাম এইরূপ সুসজ্জীভুত হইয়া, সমবেত ব্যক্তিগণের আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে-ছিল; যখন রত্নরাজি বিভুষিত, দেবমন্দিরস্থ মণি মাণিক্যের নয়ন তৃপ্তিকর বিমল জ্যোতিতে, নিশানাথ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া, যেন কাশীর দেবমন্দিরের শোভা দর্শন করিবার অভিলাষেই গগণ সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন, যখন জগন্মাতা মহাদেবী অন্ন-পূর্ণার পূজার সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, সন্ন্যাসিগণ "হর হর ববম্ ববম্" শব্দে এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ "শিবদুর্গা শিবদুর্গা" শব্দে সমস্ত দেবমন্দির পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল, যখন ধুপ, ধূনা ও অন্যান্য নানাপ্রকার সৌগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে, চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল, তখন, পূর্ব্বোক্ত যোগী পুরুষ, অন্নপূর্ণা মন্দি-রের নিকটস্থ এক বিল্বমূলে উপবেশন করিয়া, মুদিত নেত্রে, সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক

ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছিলেন। প্রায় ৩৷৪ ঘণ্টাকাল এইরূপ নিবিষ্টচিত্তে উপাসনা করিয়া, যোগীবর সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহচর লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এরূপ উৎসবের সময়ে, সহসা যোগীবরের স্থানান্তর গমন দর্শনে, আমি পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া যোগীবরের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, সম্মুখে একটী অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অরণ্যে যোগীবরকে প্রবেশ করিতে দর্শন করিয়া, আমিও দ্রুতপদ-বিক্ষেপে যোগীবরের নিকটস্থ হইয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। আরণ্য বৃক্ষসকলের সৌন্দর্য্য ও নানাপ্রকার সুবর্ণবর্ণে চিত্রিত মনোহর বিহঙ্গমকুল দর্শনে এবং তাহাদের শ্রবণ তৃপ্তিকর কাকলী শ্রবণে, মুগ্ধ হইলাম। এইরূপ বনের শোভা দর্শন করিয়া গমন করিতেছি, সহসা যে দৃশ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক, এবং ভয়ে শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত হইল! আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, অনিমিষ নয়নে, কেবল বৃক্ষাবদ্ধা রমণীর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম! অহো! সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব কি অমূল্য রত্ন! সেই রত্ন, অপহৃত হইবার উপক্রম হইলে, সতী রমণীগণ কি ভীষণ, কি লোমহর্ষক, কি প্রচণ্ড মূর্ত্তিই ধারণ

করেন। সেই তেজঃসম্পন্না, সেই উগ্রা, সেই ভয় বিহ্বলা প্রখর-মূর্ত্তি নয়নগোচর করিলে, জগতে এমন ব্যক্তিই নাই, যাহার মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়। যে নরাধম দস্যুগণ, অহোরাত্র কেবল শাণিত করাল কর-বাল হস্তে ধারণ করিয়া, শত শত গৃহস্থের বাটীতে দিবাভাগেও নির্ভয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ, গৃহদগ্ধ ও নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক কার্য্য করিয়া, অধিবাসিগণের জীবন নাশ পূর্ব্বক আপনা-দিগের জীবন নির্ভীক ও পাষাণতুল্য কঠিন করিয়া তুলিয়াছে; সতী রমণীর সতীত্বের এ প্রজ্বলিতা-মূর্ত্তি দর্শনে, সেই নির্ভীক দস্যুদলও নিশ্চয়ই ভীত হই-বেক। যে নিশাচর পরস্বাপহারকগণ, মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার রজনীতে, হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ, অসংখ্য অসংখ্য নিবিড় অরণ্য, নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়া তন্মধ্যস্থিত, করাল বদনা কালিকা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, নিপতিত-রক্তধারা-বিভুষিতা, মুণ্ডমালা-বিমণ্ডিতা রুধির পানে তৃষিতা লোলজিহ্বা চতুর্হস্তে রুধিরাক্ত অস্ত্র সুশোভিতা কালীমূর্ত্তি দর্শনেও ভীত না হইয়া, সেই ভীষণ-মূর্ত্তি কালিকা দেবীর উপা-সনান্তে, বরলাভ করিয়া, অসি, চর্ম্ম, ভল্লধারী, অসুর-তুল্য বলবীর্য্যশালী, রক্ষকের সুরক্ষিত ধনাগার হইতে ধন অপহরণ করিবার সময়ে, সম্মুখে মৃত্যুর বিকট

মুখব্যাদান দর্শন করিয়াও, তৎকার্য্য হইতে অপসৃত না হইয়া, নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়; সতী রমণীর এ ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে, সেই নির্ভীক, পাপাত্মা, পরস্বাপহারকগণেরও হৃদয় স্তম্ভিত ও প্রাণ, ভয়ে কম্পিত হইবেক। যে নির্ম্মম, নির্দ্দয় যোদ্ধৃবর্গ, বাল্যকাল হইতে নিরবধি যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, অগণিত মানবের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক, হৃদয় নির্ভীক করিয়াছে; যুদ্ধে নিযুক্ত সময়, বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত কামানের প্রজ্বলিত গোলা, নিজের অঙ্গে পতিত হইতে দেখিয়াও, নির্ভয়ে বক্ষঃস্থলে সেই প্রজ্বলিত গোলা ধারণ করিয়া একটীমাত্র বিপক্ষ বধ করিতে সক্ষম হইলে, আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, সতী রমণীর এ তেজঃপুঞ্জ-প্রখর-মূর্ত্তি দর্শনে, সে নির্ভীক যোদ্ধৃগণও নিশ্চয়ই ভীত হইবেক। তাহা না হইলে, এই হস্তপদবদ্ধা, সৌন্দর্য্যশালিনী, ষোড়শী যুবতীর অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া, ঐ অভ্রোন্নত গ্রীবাদেশোপরি প্রকাণ্ড মস্তক সুরক্ষিত, দীর্ঘ কেশপাশ সংযুক্ত জটাজাল জানুদেশে নিপতিত, উন্নত ললাট ও স্ফীত কপোলমধ্যস্থ কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষু সংযুক্ত, তালবৃক্ষ সম দীর্ঘ হস্ত পদাদি সমন্বিত, সর্ব্বাঙ্গ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে সমাচ্ছাদিত, পশুচর্ম্ম পরিহিত আট দশ জন মনুষ্য, কেন প্রাণনাশক বিষাক্তবাণ ধনুকের গুণে সংযুক্ত করিয়া চিত্রার্পিতের

ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে? এবং কেনই বা উহাদের কাহারও কাহারও হস্ত হইতে ধনুঃ ভূমিতে পতিত হইয়া গিয়াছে? ধন্য সতী রমণি! ধন্য তোমাদের সতীত্ব! ধন্য তোমাদের সতীত্ব রক্ষার অদ্ভুত কৌশল! আর ধন্য তোমাদের সে মূর্ত্তি, হৃদয়ের শোণিত শোষণকারী যে ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া, এই ধনুর্ব্বাণধারী, কালান্তক যম সদৃশ বিকটাকার আট দশজন, ইহারা মনুষ্য কি পিশাচ, দেব কি দৈত্য, তাহা কে বলিতে পারে? সতীর শরীর স্পর্শ করা দূরে থাকুক, কেবল ধনুর্ব্বাণ হস্তে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। জীবিতের কোন লক্ষণ ইহাদের শরীরে দৃষ্ট হয় না। কেবল বজ্রাহত পথিকের ন্যায় দণ্ডায়মানমাত্র রহিয়াছে। সেই মূর্ত্তিকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়াও, হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। জগতের রমণিগণ! তোমরাও একবার এ অপরূপমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাও। সতী রমণীর এ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি, দর্শন করিলে তোমাদেরও অনেক উপকার হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে, সতীত্ব যে কি অমূল্য রত্ন, কি গৌরবের বস্তু, কি সৌন্দর্য্যের আধার, তাহা একবার দেখিয়া যাও। তাহা একবার বুঝিয়া যাও। সতী স্ত্রীর সতীত্বের এ সুন্দরদৃশ্য দর্শন করিলে, আর তোমরা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সৌন্দর্য্যশালিনী হইতে

ইচ্ছা করিবে না। সুবর্ণ, মণি, মাণিক্য, হীরার পরিবর্ত্তে, সতীত্বরূপ মহারত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া, সৌন্দর্য্যশালিনী হইতে ইচ্ছা করিবে। হে সতীত্বহারা রমণিগণ! সতীত্ব যে কি পদার্থ, তোমরা তাহার মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া, পরম পূজ্যপাদ স্ব স্ব স্বামী পরিত্যাগ করতঃ ব্যভিচারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ। যৌবনমদে প্রমত্তা হইয়া, সুন্দর বেশভুষায় ভুষিতা থাকিয়া, নয়ন কটাক্ষে কত শত সুধাকর-বিনিন্দিত যুবকগণের মন মুগ্ধ করিয়া, তাহাদের জাতি, কুল, ধন, মান অপহরণ করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহাদিগকে বশীভুত করিয়া রাখিয়াছ। অহোরাত্র মদ্য পান, মাংস সেবন, নৃত্য গীতাদিতে অনুরক্ত থাকিয়া আপনাদিগকে পরমসুখিনী মনে করিতেছ। এবং তোমাদের অনুরক্ত, অনুগত, দাসানুদাস তুল্য, ঘৃণা-লজ্জা-ক্রোধ-মান-সম্ভ্রমবিবর্জ্জিত সেই মদ্যপায়ী, কামাসক্ত, কুলাঙ্গারগণের উপর অশেষ প্রকার প্রভুত্ব করিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত গৌরবান্বিতা বলিয়া মনে করিতেছ। এবং এই নির্ব্বোধ যুবকগণকে কেবল নয়ন কটাক্ষে মুগ্ধ করিয়াছ বলিয়া, আপনাদের সেই কটাক্ষকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিতেছ, ও অনুগত ভৃত্যের দলবৃদ্ধি করিবার জন্য নয়নকে আরও সুন্দর করিবার নিমিত্ত অঞ্জনে চিত্রিত করিতেছ। তোমরাও

একবার সতী রমণীর সতীত্বের এ জ্বলন্তমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাও। একবার অঞ্জন গঞ্জিত, কৃষ্ণবর্ণ লোমাবলি পরিপুরিত, ধনুকাকৃতি ভ্রূযুগলের নিম্নদেশে আকর্ণ বিস্তৃত, সুন্দর চক্ষু দুইটী দেখিয়া যাও।—যাহা হইতে কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, বনভাগ দগ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, সেই চক্ষু দুটী একবার দেখিয়া যাও। যে উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, আমার সম্মুখস্থ নিরন্তর হোমাদি যাগ যজ্ঞ তৎপর, যোগীপ্রবর অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই চক্ষু দুইটী একবার দেখিয়া যাও। যে চক্ষু নির্গত, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভয়ে, সেই মহাপুরুষও সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছেন না, সেই চক্ষু দুটী, আর সেই কটাক্ষটী একবার দেখিয়া যাও। তাহা হইলে, তোমরা আর যৌবনমদে প্রমত্তা হইয়া, অনিত্য যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিতা থাকিয়া, ব্যভিচারবৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না। তাহা হইলে আর তোমরা বৃথা বেশভুষায় ভুষিতা হইয়া, তাম্বুলরসে ওষ্ঠাধর সুরঞ্জিত করিয়া, দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজে মুগ্ধা হইয়া, বেশ্যাসক্ত যুবকদিগকে নয়ন কটাক্ষে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না। তাহা হইলে আর তোমরা, সিংহাসনারূঢ়া, অমাত্যগণ পরিবেষ্টিতা রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় তোমাদের পর্য্যঙ্ক সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট

হইয়া, সেই মন্দভাগা, বুদ্ধি বিবেকশূন্য, সুরাসক্ত যুবকগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া সুরাপান ও সেই দাস-দিগের উপর প্রভুত্ব করিতে ভাল বাসিবে না। সতী রমণীর সতীত্বের সে দৃশ্য—সে সুন্দর দৃশ্য—সে অপরূপ দৃশ্য নয়নগোচর করিলে, নিশ্চয়ই তোমাদের জ্ঞানের সঞ্চার হইবেক। নিশ্চয়ই তোমাদের ব্যভিচারে ঘৃণা বোধ হইবে। নিশ্চয়ই তোমাদের বেশভূষায় অনাদর হইবেক। নিশ্চয়ই তোমরা, তোমাদের নানাবিধ মনোহর দ্রব্য সন্নিবেশিত, চিত্রপটাদি বিভূষিত ও পর্য্যঙ্কাদি পরিবৃত, সুরঞ্জিত ও সুসজ্জীভূত গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিত্য বেশভূষায় উপেক্ষা করিয়া সতী রমণীর পদসেবা দ্বারা জীবনাতিবাহিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। সতী রমণীর সতীত্বের চিত্র, জগতে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। কস্মিন্‌কালেও বিলুপ্ত কিম্বা নিষ্প্রভ হইবেক না।

ক্ষণকাল পরে, সতীর সেই প্রজ্বলিত দৃষ্টি যোগী-বরের প্রতি নিপতিত হইল। সম্মুখে একটী অপরিচিত পরম ধার্ম্মিক, তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষকে নয়নগোচর করিয়া সতীর হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণে সাহস, হর্ষ, ভক্তি ও লজ্জার সঞ্চার হইল। সেই সাহস, হর্ষ, ভক্তি ও লজ্জামাখা মুখখানি তখন অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইল।

যেমন, দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের অঙ্গস্পর্শে, মহাবীর

ক্ষত্রিয় নিধনকারী জামদগ্ন্যের সমস্ত তেজঃ অন্তর্হিত হইয়াছিল, তেমনই সতীরমণীর প্রজ্বলিত দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের তেজঃব্যঞ্জক দৃষ্টি স্পর্শ করিবামাত্রেই, সতীর শরীরের ও বদনের সমস্ত তেজঃ রহিত হইয়া, এক প্রকার অপূর্ব্ব শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তখন সেই মুখ খানিতে, কেবল সাহস, হর্ষ, ভক্তি ও লজ্জা যুগপৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। কে বলিতে পারে যে, সেই হস্ত পদবদ্ধা তেজঃপুঞ্জশালিনী রমণীমূর্ত্তি, এই শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে, এই রূপ অপরূপ মূর্ত্তিতে কিছুক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া রমণী, এক অশ্রুতপূর্ব্ব মৃদুমধুর শব্দে যোগীবরকে কহিলেন প্রভো! অন্নপূর্ণার মন্দিরের সন্নিকটে দুরাচারগণের হস্তে পতিত হইয়াই, আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, প্রভুর শ্রীচরণ যে দর্শন করিব, ইহা আর মনে করি নাই, তবে যখন অভাগিনীর পুণ্যবলে আপনি এস্থলে সমাগত হইয়া আমার সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করিয়াছেন; তখন দুরাচারগণের হস্ত হইতে আমার জীবন রক্ষা করুন।

আহা! কি মধুর শব্দ! কি অমৃতমাখা স্বর! এই অমৃত মাখা স্বর মৃতজীবের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারও জীবন সঞ্চার করে। ঐ দেখ, সেই বিকট মূর্ত্তি, মৃতপ্রায় দস্যু সকল, সতীর এই জীবন

সঞ্চারিণী অমৃত মাখা স্বর শ্রবণ করিয়াই জীবন লাভ করিয়া পলায়ন করিল।

তৎপরে যোগীবরের প্রযত্নে; সেই রমণী কাশীস্থ তাঁহার নিজ আবাসে উপস্থিত হইলেন। এই অদৃষ্ট-চর, ভীষণব্যাপার অবলোকন করিয়া, কাশীতে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থিতি করিতে আমার ইচ্ছা জন্মিল না। কাশী পরিত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া, যোগীবরকে প্রণামান্তর গমনোদ্যত হইলে, যোগীবর আমার গমনে বাদ সাধিলেন। অগত্যা, অনুরোধে বাধ্য হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে হইল। ক্রমাগত সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত, যোগীবরের সহিত সমস্ত কাশীধাম পরিভ্রমণ করিলাম। কাশীর আভ্যন্তরিক অবস্থা দৃষ্টে, আমার অন্তঃকরণে যুগপৎ ক্ষোভ ও দুঃখের আবির্ভাব হইল। হায় কি পরিতাপ! কি দুঃখের বিষয়! হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ, পুণ্যধাম কাশীভূমি যে কত শত নরাধম, কুকর্ম্মান্বিত পাপাত্মাগণে পরিপূর্ণ তাহার ইয়ত্তা নাই; এবং ঐ সকল অধার্ম্মিকগণের অধর্ম্মাচরণে পুণ্যভূমি কাশীধামকে যে কিরূপ কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা আর কি বলিব। কত শত নিরীহ ভদ্রলোক যে, ঐ সকল পাপাত্মা কপট বেশধারী অধার্ম্মিকদিগের কপটতায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমি যোগীবরকে ইহার প্রতীকারের

কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন বৎস! সময়ান্তরে তোমাকে সমস্তবিষয়ের উপদেশ প্রদান করিব। তোমার সহিত পূর্ব্বে আমার একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে; অতঃপর তুমি আর এক বার মাত্র আমার সাক্ষাৎ পাইবে; আমি অদ্য রজনীযোগে স্থানান্তরে গমন করিব। আমার সহিত অসাক্ষাৎ সময় পর্য্যন্ত, তুমি, তোমার ঈপ্সিত স্থান সকল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন কর। আমি তখন তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে ইনি আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত যোগীপুরুষ। তখন আমি সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, গুরো! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সঙ্গী করুন। তখন তিনি কহিলেন না বৎস! আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হও। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। এই বলিয়া যোগীবর দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি আমার আবাসে আসিয়া রজনী বঞ্চন পূর্ব্বক প্রভাতে কাশীধাম পরিত্যাগ করিলাম।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া, প্রায় পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত, উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেকানেক নগর গ্রাম, উপগ্রাম ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে পরিভ্রমণান্তর বিন্ধ্যাচল দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তৎপরেও অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতা নগরীতে উপনীত হইলাম। কলিকাতা নগরীর শোভা সমৃদ্ধির আর বিশেষ করিয়া কি পরিচয় দিব; এই নগর এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজধানী; সুতরাং শোভা সমৃদ্ধিতে ভারতস্থ সমস্ত নগর অপেক্ষা ইহাই শ্রেষ্ঠ। এস্থানে নানাদেশীয় লোক অবস্থিতি করিতেছে; এবং নানাপ্রকার কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ও পরিবার বর্গের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমি কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া, এই নগরীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হইলাম। চোর, দস্যু প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্কর্ম্মান্বিত কত লোক যে কলিকাতা মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই, এবং ঐ সকল ব্যক্তি যে কেমন কৌশলে স্ব স্ব অভীষ্ট সুসিদ্ধ করে, তাহা আর কি বলিব। নিরপরাধ, অজ্ঞাত কত শত ভদ্র লোক যে;

ঐ পাপাত্মাগণ দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এবং অনেক স্থলে ঐ দুরাত্মাগণ আপন আপন দুষ্প্রবৃত্তি সাধন জন্য, জীবহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত বা ভীত হয় না।

এইরূপে কলিকাতা নগরীর মধ্যে নিরন্তর পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। হায়! কি পরিতাপ! কি দুঃখের বিষয়! যে কার্য্য সাধন করিবার জন্য, জীবাত্মা পরম পবিত্র ও সর্ব্বপ্রধান মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; ও যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য, জগৎপাতা জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সেই মানবদেহে সূক্ষ্ম বুদ্ধি বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে; এবং মানবগণ যে কার্য্য সম্পাদন করিলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক সুখে যাপন; জনসমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন, পৃথিবী মধ্যে যশোভাজন, এবং পরলোকে অনন্ত সুখে মগ্ন হইতে পারেন; সংসারের এমনই মোহিনী মায়া, পাপের এমনই আপাত মধুর প্রলোভন, অর্থের এমনই মোহিনী শক্তি যে, অনেকানেক হত-ভাগ্য নরাধম; সেই মহৎ উদ্দেশ্য, সেই অবশ্য কর্ত্তব্য-কার্য্য বিস্মৃত হইয়া; কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী থাকিয়া, নানা-প্রকার ঘৃণিত; দূষিত ও ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন দ্বারা, লোক-সমাজে ঘৃণিত, পৃথিবী মধ্যে নিন্দিত, ও জীবিত কাল অনন্ত কষ্টে পতিত হইয়াও

সেই ঘৃণিত ও জঘন্য বৃত্তির অনুসরণ করিতে নিবৃত্ত হয় না। হায়! হায়!! কেন যে মানবগণ এই রূপ কুকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হয়, তাহা কেমনে বুঝিব? অনেক দেশীয় অনেক লোক, চাক-রীর জন্য এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহারা সাধারণ চাকুরে বাবু নামে অভিহিত। ইদানীং এত-দ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ চাকরী বা (দাসত্বকে) এত গৌর-বের ও সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করেন যে, অনে-কানেক শিক্ষিত, ধনবান ব্যক্তি, যাঁহাদের জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাঁহারাও, এই সম্মান সুচক পদ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত লালায়িত। সর্ব্বপ্রকার জাতিই, এক্ষণে চাকরী করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎ-সুক ও নিয়ত চেষ্টিত। প্রত্যেক শ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গই, আপন আপন জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, চাকরী করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী। যাহাদের পুর্ব্ব-পুরুষগণ, আপনাপন জাতীয় বৃত্তির অনুসরণ করিয়া, তদুপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা, সাধ্যমত সমাজের উপকার সাধন, পরিবার প্রতিপালন ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিয়া, সুখে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়া-ছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এক্ষণে পুর্ব্বপুরুষের সেই উপজীবিকা বৃত্তিকে ঘৃণিত, নিন্দিত ও দূষিত বৃত্তি বলিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "চাকুরে বাবু"

উপাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য, কত জনের কত তোষা-
মোদ করিতেছেন। এবম্প্রকারে অনেক দিন উমে-
দারীর পর চাকরী প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সেই
চাকরী উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সমাজের ও দেশের উপ-
কার সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা দ্বারা না নিজের
ভরণ পোষণ সঙ্কুলান, না পরিবার প্রতিপালন না সুখে
সংসার যাত্রা যাপন, কোন বিষয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন
হয় না; পরন্তু, তাঁহারা, সর্ব্বদা তাঁহাদের উপরিস্থ
চাকুরে বাবুগণ দ্বারা, গঞ্জিত, অপমানিত; এমন কি
সময়ে সময়ে প্রহারিত হইয়াও, অতি কষ্টে জীবনযাত্রা
নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কি দুঃখ! কি পরিতাপ! কি আক্ষেপের বিষয়!
যে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে শাস্ত্রালোচনা, বেদাধ্যয়ন, দেব
সেবা, হোম যাগ যজ্ঞাদি দৈবকার্য্য সকল সম্পাদন
দ্বারা, জনসমাজের অশেষ প্রকার উপকার সাধন
দেশের উন্নতি ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়া, সমস্ত লোকের
নিকট দেবতুল্য পূজিত হইয়া, পরম সুখে ও সগৌরবে
জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন; সেই ব্রাহ্মণ
সন্তান সন্ততিগণ, এক্ষণে তাঁহাদের সেই পরম সমাদৃত,
মহা গৌরবান্বিত ও যশস্বিনী বৃত্তিকে ঘৃণিত ও জঘন্য
মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাকরী (দাসত্ব-
বৃত্তি) অবলম্বন করিয়াছেন। এবং যশস্বী ও সুখ্যাতি

ভাজন হইবার প্রত্যাশায়, উপরিস্থ কর্ম্মচারী ম্লেচ্ছগণের ও পদ পুজাদ্বারা মনস্তুষ্টি করিতে পরাঙ্মুখ না হইয়া, তৎকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং সেই চাকরী উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ না হওয়ায়, অশেষ প্রকার ঘৃণিত ও কুৎসিৎ প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করাকে পাপ মনে না করিয়া তদনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন, যে জাতীয় লোকের কর্ত্তব্যকার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল, শত্রুদমন ও যুদ্ধকার্য্যই যাঁহাদের ব্যবসা ছিল, শারীরিক তেজঃ ও বল যাঁহাদের উন্নতির সোপান ছিল, সেই জাতীয় লোক, এক্ষণে আধুনিক গৌরবান্বিত ও সম্মানিত চাকরী পদ প্রাপ্ত হইয়া সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

এক্ষণে, আদেশ প্রতিপালন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে; তোষামোদ ও মনস্তুষ্টি করা তাঁহাদের ব্যবসা হইয়াছে, নিস্তেজতা ও ভীরুতা তাঁহাদের অবনতির একমাত্র কারণ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় তন্তুবায়গণের মধ্যে, প্রায় অনেকেই এক্ষণে বস্ত্র বয়ন পরিত্যাগ করিয়া চাকরী অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে যে সমস্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সকল দেশে পরম সমাদৃত ছিল; ঢাকা, শান্তিপুর, সিমলা প্রভৃতি স্থানের বস্ত্র সকল দেশের

সকল লোকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিত; এবং অদ্যাপি ঐ সকল স্থান বস্ত্রাদি প্রস্তুত ও শিল্প নৈপুণ্য জন্য পৃথিবী মধ্যে বিখ্যাত আছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল শিল্পকর গণের, বস্ত্রবয়নের প্রতি অনাস্থা হওয়াতে, তৎকার্য্যের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। যে সময়ে অন্যান্য দেশের লোক সকল, বস্ত্রের অভাবে বৃক্ষের ত্বক্, পশু চর্ম্ম ইত্যাদি পরিধেয় সকল পরিধান করিয়া কালযাপন করিত এবং যদ্দারা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি বা পরিধান জনিত সুখে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, বরং কঠিন বৃক্ষের ত্বক্ পরিধান করায় শরীর ক্ষত বিক্ষত ও পশু চর্ম্ম পরিধান জন্য, নিরন্তর দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত, তৎকালের বহু পূর্ব্ব হইতে, আমরা বুদ্ধিবলে পরিধান উপযোগী কোমল ও পরম সুদৃশ্য বস্ত্র সকল বয়ন করিয়া তাহা ব্যবহার করিতাম; ও সেই সকল বস্ত্র দ্বারা সভ্যতা, শরীরের সৌন্দর্য্য ও সুখ বৃদ্ধি হইত।

আমাদের কৃত বস্ত্রাদির উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এবং তদ্দারা অসভ্যতা দূরীকরণ ও পরিধান জনিত অসীম কষ্টের অপনোদন হইতে দেখিয়া, যাহারা তাহার আদর্শ লইয়া বস্ত্র বয়ন করিতে শিক্ষা করিয়াছে; এক্ষণে তাহাদের দেশেই, বস্ত্র বয়নের পূর্ণোন্নতি হইয়াছে। তাহারাই এক্ষণে অন্যান্য

দেশে, সেই সকল বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। কি দুঃখের বিষয়, যে আমরা সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধিবলে বস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপযোগিতা সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব লোক দিগকে জ্ঞাত করাইয়া দিয়াছি, আমাদের কৃত যে বস্ত্রাদি পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে অন্যান্য দেশে আমদানি হইত, সেই আমরা, এক্ষণে বিদেশাগত বস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, বিলাতী বস্ত্রে ভারত পরিপূর্ণ। অস্মদ্দেশস্থ সমস্ত লোকই; এক্ষণে বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। যদি একমাস কাল ইংলণ্ড হইতে এদেশে বস্ত্রের আমদানী না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় অস্ম-দ্দেশস্থ লোক দিগকে, লজ্জা নিবারণের জন্য, পুরা-কালের প্রথার ন্যায়, বৃক্ষের ত্বক্ কিংবা পশু চর্ম্ম পরিধান করিতে হয়। অধুনা এতদ্দেশে, যে অল্প পরিমাণ বস্ত্রাদি উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মহার্ঘতা বিবেচনায়, আমরা তাহা ক্রয় না করিয়া, সুলভ মূল্যে ইংলণ্ডীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিবার প্রত্যাশায়, ইংরাজগণের মুখাপেক্ষা করিতেছি! কিন্তু বহু দূর দেশ বাসী ইংলণ্ডীয়গণ, বহু বহু সাগর ও মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা তদ্দেশ হইতে বস্ত্র আনিয়া; যে কি প্রকারে আমাদের নিকট, আমা-দের দেশজাত বস্ত্র অপেক্ষাও সুলভ মূল্যে বিক্রয় দ্বারা

বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে; তাহা আমরা এক বারও ভাবিয়া দেখিনা। কি কৌশল অবলম্বন করিলে, যে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে বস্ত্রের উৎপত্তি ও তাহার মূল্য সুলভ হইতে পারে, তাহা আমরা এক বারও চিন্তা করিয়া দেখিনা। যে কৌশল অবলম্বনে, বস্ত্র বয়ন করিয়া, বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা ইংরাজগণ, এদেশে, সেই বস্ত্রের আমদানি করিয়া, অস্মদ্দেশজাত বস্ত্র অপেক্ষাও সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে, আমরা সেই কৌশল অবলম্বনে বস্ত্র বয়ন করিলে, যে আমাদের দেশজাত বস্ত্র, বিলাতী বস্ত্রের মূল্যাপেক্ষা শতগুণে অল্প হইতে পারে তাহা আমরা একবারও অনুধাবন করিনা; সে কৌশল একবারও চিন্তা করিনা। অথচ আমরা এক এক জন বড় বড় পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ উপাধিধারী গ্রাজুয়েট। আমি বিজ্ঞানের এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি, আমি অতি বুদ্ধিমান, আমি মহাপণ্ডিত, আমি অহঙ্কারে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিনা।

হা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারি! তোমার ঐ অকিঞ্চিৎকর এম, এ উপাধিতে, কে তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করিবে? তোমার ওরূপ অমূলক অহঙ্কারে কে তোমাকে ভয় করিবে? এবং কেনই বা লোকে তোমাকে গ্রাজুয়েট বলিয়া

তোষামোদ করিবে। যদি তোমার দ্বারা, জন সমাজের কোন উপকার সাধিত না হইল, যদি তোমা দ্বারা, জাতি বিশেষ ও জন বিশেষের কোন মঙ্গলই না হইল, যদি তোমা দ্বারা, স্বদেশ ও স্বজাতির হিতকর কোন কার্য্যই সম্পাদিত না হইল, তবে তোমাকে লোকে পণ্ডিত বলিয়া কেন স্বীকার করিবে? তবে তোমাকে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বলিয়া লোকে কেন মান্য করিবে? যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, সাধরণের জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক না হইল, তোমার জীবনের লক্ষ্য, কোন স্বদেশ হিতকর বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হইল, যদি কেবল উদর পূর্ত্তি করাই, তোমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য হয়, তবে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক বনচারী জীবের সহিত তোমার প্রভেদ কি? ভাবিয়া দেখ দেখি, রীতি-মত বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, যদি দেশের ও জন সাধা-রণের উন্নতি-কর কোন যন্ত্র কি কোন কার্য্য, কি কোন কৌশল আবিষ্কার করিতে না পারিলে, তবে তোমার সে বিজ্ঞান শিক্ষার ফল কি? তবে তোমার সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এ. উপাধির গৌরব কি? তবে তোমাকে লোকে কেন সমাদর করিবে? তুমি শারীরিক স্বাস্থ্য, বল ও বীর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, সে জাতির আনুগত্য লাভ করিয়া, যাহাদের নিকট ঐ

পরম সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছ; তাহারা ভিন্ন আর কেহ তোমাকে সমাদর করিবে না। কেবল তাহারাই, তোমাকে সমাদর করিয়া সেই চাকরের উচ্চ পদবী প্রদান করিবে—যে চাকরীর গৌরবে তুমি সময় সময় তোমার পিতাকেও মানুষ বলিয়া মনে করনা। কিন্তু আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ, তোমাপেক্ষা, যে পরোপকারী ব্যক্তি, পরের দুঃখ দেখিলে অসঙ্গতি নিবন্ধন অর্থদ্বারা উপকার করিতে অক্ষম হইলেও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাহার দুঃখ মোচনের চেষ্টা করে, যে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি. নিঃস্বার্থে নিম্নশ্রেণীস্থ বর্ব্বর লোক দিগকেও কিছু কিছু শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে; যে অনভিজ্ঞ ও অকৃতবিদ্য কৃষক, সমস্ত দিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ উপেক্ষা করিয়া, মানব গণের জীবন রক্ষা কারী শস্যোৎপাদনে সচেষ্ট আছে, তাহাদিগকে শিক্ষিত; পণ্ডিত, ও স্বদেশহিতৈষী বলিয়া মনে করিবে। এই প্রকার বি, এ, এম, এ উপাধী প্রাপ্ত শিক্ষিত পণ্ডিত মণ্ডলীর ও উচ্চপদাভিষিক্ত চাকুরে বাবু গণের অহঙ্কারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথা হইতে প্রস্থানান্তর বিন্ধ্যাচল অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিন্ধ্যাচলের প্রায় বিংশতি ক্রোশ উত্তরে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর আছে। ঐ প্রান্তরের আয়তন প্রায় তিন ক্রোশ। প্রান্তরের মধ্যে বৃক্ষলতাদির অস্তিত্ব দূরে থাকুক, তৃণ মাত্রও বিদ্যমান নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে বালুকারাশি স্তূপাকার থাকিয়া, রৌদ্রের সংযোগে জলাশয় বলিয়া পথিকগণের ভ্রম জন্মাই-তেছে। কলিকাতা নগরী হইতে বহির্গত হইয়া, তিন মাস পর্য্যটনের পর, আমি এক দিবস মধ্যাহ্ন কালে, এই প্রান্তর অতিক্রম সময়ে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠাবস্থায় ঐরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া বৃথা পর্য্যটনে অতি-মাত্র ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। একে বৈশাখী রৌদ্র অগ্নি শিখার ন্যায় শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাতে আবার পদতলস্থ বালুকা রাশির প্রত্যেক বালুকা কণা, প্রখর-সূর্য্য-কিরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উত্তপ্ত হইয়া, পদতল নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। অধিকন্তু ক্ষুধায় শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তথায় এমন কোন স্থান নাই, যেখানে যাইয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া এ বিষম যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাই, কিম্বা এমন কোন খাদ্য ও পানীয় নাই যাহা ভক্ষণ ও পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করি। প্রত্যেক

মুহূর্ত্তকেই, জীবনের শেষ ভাগ বলিয়া মনে করিতেছি। হায়! অবিলম্বেই আমার প্রাণ পক্ষী এ দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে। এই মরুভূমির বালুকাকণার সহিত আমার শরীরের পরমাণু সকল মিশ্রিত হইয়া যাইবে। আর রক্ষা নাই! বিন্ধ্যাচল দর্শন. বা গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ, কিছুই সংঘটিত হইল না। আর সেই অভাগিনী, হায়! তাহার দুঃখের কথা মনে হইলে, আমার এই বর্ত্তমান মুমূর্ষ সময়ের যন্ত্রণাও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই পতি-বিয়োগ-বিধুরা অভাগিনী, হয়ত আহার নিদ্রা পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল ধূলি শয্যা শায়িনী হইয়া, নির-ন্তর চক্ষুজলে ভূমি প্লাবিত করিতেছে, হয়ত অবিশ্রান্ত চীৎকারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া, মৃত্যু প্রার্থনা করি-তেছে, হয়ত শোক-দুঃখে অভিভূতা হইয়া মোহাব-স্থায় আমার সহিত মিলন অনুভব করিয়া, এই অবধি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইল মনে করিয়া, অপার আনন্দানুভব করিতেছে, পরক্ষণেই জ্ঞানলাভ করিলে আমার অদর্শন জনিত বিচ্ছেদানল, পুনরায় নবাভুত হইয়া, অভাগিনীকে প্রবলবেগে দগ্ধ করিতেছে। মনে বাসনা ছিল, জীবনের শেষভাগে একবার সেই অভা-গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু তাহা আর হইল না। আর সেই জননী, হায়! তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায়

কি কষ্ট; আমার জন্য তিনি, যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা মনে হইলে আর মুহূর্ত্তমাত্র জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমিই তাঁহার কষ্টের এক মাত্র কারণ। এই অপরাধের জন্য জগদীশ্বর আমার নিমিত্ত যে কি, যন্ত্রণাদায়ক নূতন শাস্তি প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা এক্ষণে আমি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাকে প্রসব করিয়া, আমার মুখ দেখিয়াই, সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া কেবল আমার লালন পালনে নিযুক্ত ছিলেন; তদবধি যাঁহার স্নেহে ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া, আমি এত বড় হইয়াছি; এখনও যাঁহার স্নেহে, কত কত নদ, নদী, পর্ব্বত, উল্লঙ্ঘন করিয়া, এতদূরে আসিয়া, আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে; ইচ্ছা ছিল, চরম কালে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করত, পদতলে পতিত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু তাহা আর হইল না। আর সেই পরমারাধ্য পিতা, যাঁহার সংসার সাগরের আশা তরণীর এক মাত্র বহিত্র আমি, তিনি সেই বহিত্র হারা হইয়া সংসার সাগরের অকূল তুফানে আশা-তরী ডুবাইয়া, নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছেন। যিনি পরিণামে সুখের আশা করিয়া, অনাহারে নিজের শরীরকেও কষ্ট দিয়া, বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা, আমার বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছেন, তাঁহার

এই অন্তিম সময়, তিনি সেই আশায় বঞ্চিত হইয়া, হতাশ্বাস-হৃদয়ে কেবল রোদন করিতে করিতে; দিন যাপন করিতেছেন। ইচ্ছা ছিল জীবনের অন্তিম সময়ে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু তাহা আর সংঘটিত হইল না! আর মূহুর্ত্ত পরেই, আমার জীবন বায়ু, সকল যন্ত্রণা, সকল চিন্তা লইয়া, এদেহ পরিত্যাগ করিবে। আর আমাকে পিতামাতার চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি অসীম অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য, অনন্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া, অনন্ত কালযাপন করিব। এইরূপ ভাবনায় অভিভুত হইয়া গমন করিতেছি, কিন্তু আর গমনের শক্তি নাই, ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া, প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়াছে, প্রচণ্ড সুর্য্যের উত্তাপে শরীর দগ্ধ করিতেছে, একটু দৃষ্টি শক্তি ছিল, তাহাও তিরোহিত হইল, মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছে, শরীর অবসন্ন হইল, ঘূর্ণায়মাণ হইয়া ভুমে পতিত হইতেছি, ভুতলশায়ী হইবার অগ্রেই, কে যেন আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রক্ষা করিল। আমি তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ ও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলাম। বোধ হইল যেন, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমায় দুরবস্থা দর্শনে, সাতিশয় কৃপালু

হইয়া, আমার জীবন রক্ষার্থ নীলবর্ণ নীরদমালা প্রেরণ করিলেন। তাহারা আমার আততায়ী রৌদ্রের অত্যাচার দর্শনে, ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মেঘ সকলের পরাক্রম দর্শনে, যেন ভীত হইয়াই রৌদ্র ভয়ে পলায়ন করিল। তখন জল-কণাবাহি শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া, দগ্ধ শরীরের বিষম জ্বালার নিবৃত্তি করিল। পতিত জল-ধারা পানে পিপাসার শান্তি হইল। শরীর শান্ত হইল। ইন্দ্রিয় সকল সবল হওয়ায়, পুনরায় গমনের শক্তি জন্মিল। আমি তখন দ্রুতপাদ বিক্ষেপে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে উপনীত হইলাম। যদিও গগনব্যাপী নবীন নীরদ মালায়, চন্দ্রমা-কিরণ আচ্ছাদিত হওয়ায়, পৃথিবীকে উষানুরূপ ম্লান করিয়াছিল, যদিও অবিশ্রান্ত বারি-পতনে গ্রামের সমস্ত শোভা অন্তর্হিত হইয়াছিল, তথাপি গ্রামটি যে বিলক্ষণ সুন্দর ও ভদ্রলোকের বাস ভূমি, তাহা আমার অনুমান করিতে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। গ্রামমধ্যস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়, সবিস্তৃত রাজবর্ত্ম, ইত্যাদিতে গ্রামের উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। অধিবা-সিগণের সকলেরই বাসবাটী, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া; এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য

স্বীকার করিলাম আমি তথায় উপনীত হইবামাত্র পরম সমাদরে আদৃত হইলাম। আসন প্রদত্ত হইলে, আমি উপবেশন করিলাম। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, পথশ্রান্তিজনিত অসীম কষ্টের অপনোদন হইল। গৃহস্বামিদিগের রীতি নীতি, দর্শনে, পরম পুলকিত হইলাম। তাঁহারা আমার সহিত চির-পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট আশাতীত যত্ন ও সুজনতা, প্রাপ্ত হইয়া, মুগ্ধ হইলাম। আহারের সময় উপস্থিত হইলে, একত্র ভোজন করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলাম। তৎপরে সুকোমল শয্যাশায়ী হইয়া, সুনিদ্রার ক্রোড়ে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। তাঁহাদের যত্নে বাধ্য হইয়া প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় অবস্থিতি করিতে হইল। এই অনতিদীর্ঘ সময়ও তাঁহাদের সহিত একত্রে সহবাসহেতু আমার সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্য রহিল না। এমন কি স্ত্রীগণও আমার নিকট তাঁহাদের মনোবেদনা বর্ণনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা বা শঙ্কিতা হইতেন না।

এই সংসারের উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী, ও পরিবার মণ্ডলীর সুখ সৌভাগ্য দর্শনে, আমার আর আহ্লা-দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু শারদীয় পূর্ণ শশধর, সুধামাখা রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া, কতক্ষণ মানব-

গণের মন প্রফুল্ল রাখিতে পারে? দুরাত্মা কালমেঘ, কোন্ দিক হইতে আসিয়া, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত আনন্দ, তিরোহিত করে তাহা কে বলিতে পারে। যেমন পুষ্পে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, পদ্মে কণ্টক আছে, তেমনই এই আনন্দময় সংসারের একটী দুঃখজনক ব্যাপারে, আমাকে নিরানন্দ করিয়া তুলিল। এক দিন হঠাৎ এক বিরস বদনা; সজলনয়না, আলুলায়িতকেশা, মলিনবেশা, ষোড়শবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী যুবতী, মৃদুমন্দ গতিতে আমার সম্মুখ ভাগ অতিক্রম করিলেন। আকৃতি, প্রকৃতি দর্শনে, তাঁহার আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুমান করিতে আমাকে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। এবং যদিও আমি এই রমণীকে এবাটীতে আগমনাবধি পূর্ব্বে আর এক দিনও নিরীক্ষণ করি নাই, তথাপি তিনি যে এই বাটীস্থ কোন এক কুলবধূ, তাহা আমার অনুমান করিতে বাকী রহিল না। এই পরমাসুন্দরী যুবতীর ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমার অন্তঃকরণ বিষম শোকার্ণবে নিমগ্ন হইল। কিন্তু এই সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে, কেবল এই রমণীর মনোবেদনার কারণ কি, তাহার কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, নিরন্তর চিন্তার অভিভূত থাকিয়া, তথায় আরও দুই এক দিবস আমাকে অবস্থিতি করিতে হইল। ইতি

মধ্যে কোন সময়ে, এক বৃদ্ধা রমণীর প্রমুখাৎ এই রমণীর দুঃখের সমস্ত কারণ অবগত হইলাম। হায়! অভাগিনী তাহার এই সুখময় যৌবন সময়ে, স্বামী-রত্নে বঞ্চিতা হইয়া, যৌবনের অকূল তুফানে পড়িয়া, কেবল কাণ্ডারীহারা তরণীর ন্যায় নিরন্তর বিপর্য্যস্ত হইতেছে। প্রণয়ীর প্রণয় পীযূষ পূর্ণ অধর সুধাবিন্দু পান ব্যতীত, সেই মাধ্যাহ্নিক কমল সদৃশ মুখার-বিন্দ, স্বায়ংকালীন কমলের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে; হৃদয়ানন্দবর্দ্ধনকারী প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া, নয়ন অবিরল অজস্রধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, বিলাস প্রিয়তমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, কেশ-দাম জীবন সাগরের যৌবনতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দেহ তরণীতে নৃত্য করিতেছে, শোকে দুঃখে, ও অভি-মানে চম্পকবিনিন্দিত সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। এই রমণীর দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। হায়! কি দুঃখ! কি পরিতাপ! কি আক্ষেপের বিষয়। যে পবিত্র প্রণয়, জগতে অতি দুর্লভ, যে পবিত্র প্রণয় লাভে সমর্থ হইলে, দম্পতি সকল এই বিপদ সঙ্কুল, অনিত্য সংসার মাঝে, বসতি করিয়াও, এই নশ্বর দুঃখসহিষ্ণু জীবনকে সুখের সেতু মনে করে; এবং সাংসারিক নানা প্রকার বিপদকে উপেক্ষা করিয়া, স্বর্গসুখ তুল্য প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিবার আশায়, এই

সংসারে অনন্তকাল বাস করিবার ইচ্ছা করে; যে প্রণয় পীযূষের অপূর্ব্ব সুখময় আস্বাদনে মুগ্ধা হইয়া, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজকুলবধূ জনকনন্দিনী রাম বণিতা সীতা, রাজপুরী তুচ্ছ করিয়া, যমপুরী সদৃশ বিপজ্জনক নিবিড় অটবীকে পরম সুন্দর মনে করিয়া, তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং বিবিধ রত্নালঙ্কার পরিশোভিত অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ অনাদর পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া, দুর্গন্ধ কঠিন পশুচর্ম্ম পরম সমাদরে পরিধান করিতেন; এবং নানাবিধ সুগন্ধি, ও সুদৃশ্য, বিলাস দ্রব্যে অবজ্ঞা করিয়া, বিভূতিই অঙ্গের একমাত্র সুন্দর ভূষণ মনে করিয়া, তাহা ব্যবহার করিতেন; ও স্বর্ণপাত্র পরিপূরিত সুস্বাদু রাজভোগে ঘৃণাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, কটু, তিক্ত ও অম্ল বন্যফল আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেন; এবং যে প্রণয় পীযূষ পানাশায় সেই পতিব্রতা সাধ্বী সীতা, রাবণগৃহে বসতি হেতু, বিবিধ মতে গঞ্জিতা, নিন্দিতা ও অপমানিতা হইয়া, এক দিনও জীবন পরিত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন নাই; অধিকন্তু প্রণয়ামৃত পানে অমর হইয়াছি মনে করিয়া, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন; এবং কেবল সেই সাহসেই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া, অদগ্ধা শরীরে অগ্নি হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন; এবং যে প্রণয়ামৃত

পানে অন্ধ হইয়া রজঃস্বলা দ্রুপদনন্দিনী দৌপদী, প্রাণনাথের কৃতকার্য্য দোষে কৌরবগণ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ও তিরস্কৃতা হইয়াও, এক মুহূর্ত্তের জন্যে সেই প্রাণপতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই; এবং বিরাট রাজ-গৃহে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াও, এক দিবসও ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করেন নাই; এতাদৃশ সুখজনক অমূল্য পবিত্র প্রণয়ের বিরোধী হইয়া, দুর্ভাগা বারনারীগণ এই সংসার মাঝে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা, প্রতিনিয়ত কৃত্রিম, আপাতমধুর ভালবাসার মোহিনী মায়ারূপ মরীচিকায় আশ্বাসিত করিয়া যুবকগণকে পবিত্র প্রণয় পথ হইতে বিচ্যুত রাখিয়া, নিরন্তর তাহাদের সেই বিষময় প্রেম মরিচিকায় বিঘূর্ণিত করিতেছে। ও নানামতে কষ্ট প্রদান করিতেছে। যেমন কাল মেঘ, গগণে প্রকাশিত হইয়া, চকোর চকোরী গণকে, সুধা-ময় সুধাংশুর সুধাপানে বঞ্চিত করে, যেমন প্রবল বাত্যা প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়া, প্রশান্ত মূর্ত্তি স্থির সাগরের সলিল রাশিকেও আন্দোলিত, ও আকু-লিত করে, তেমনই সমাজবিচ্যুতা কলঙ্কিনী বার-বণিতাগণ; সংসার মাঝে অবস্থিতি করিয়া, যুবক-গণকে পবিত্র প্রণয়ের, প্রণয় সুধাপান হইতে বঞ্চিত

করিতেছে; ও কৃত্রিম প্রণয় প্রবাহিত করিয়া শান্ত-শীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণেরও হৃদয় আন্দোলিত, ও আকুলিত করিতেছে। এই রমণীগণ, প্রকৃতই সংসার সরসীর প্রণয় সুখ সরোরুহের কণ্টক স্বরূপ। ইহা-দের দ্বারা এই সংসার মধ্যস্থ কত শত যুবকযুবতী যে অনন্ত কষ্টে পতিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যে পতিব্রতা সরলস্বভাবা সুরূপা কামিনীর, পতিই, এক মাত্র অবলম্বন; ও যাহাদের জীবনের সুখ দুঃখ কেবল তাহাদের সেই পতির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই পতিব্রতা রমণীগণের জীবন সর্ব্বস্ব পতিগণ, এই কলঙ্কিনী, কুটিল স্বভাবা, বারনারীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অশেষ গুণসম্পন্না, সুশীলা স্ব স্ব সহ-ধর্ম্মিণীদিগকে বিরহানলে চিরকাল দগ্ধীভূত, ও নিরন্তর অশেষ প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। এই প্রকার বেশ্যাসক্ত যুবকগণ, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ও বিদ্বান হইলেও, তাহারা নরকুল কলঙ্ক স্বরূপ। তাহাদের মুখাবলোকন করিলেও প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হয়। ইহাদিগকে পরিপক্ক তৈলে ভৃষ্ট করিলেও, ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বা কৃতাপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হয়না। মুগ্ধ স্বভাবা সচ্চরিত্রা রমণীগণ, স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা হইয়া, বেশ্যাসক্ত স্বামীর পীড়নে পীড়িতা হইয়া, যে কিরূপ ম্রিয়মাণা হয়, ও মনকষ্টে

দিন যাপন করে, তাহা আর আমি এ সামান্য লেখনীর সাহায্যে কিরূপে বর্ণনা করিব। যে ব্যক্তি, এই রূপ স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, বেশ্যাশক্ত স্বামীর পীড়নে প্রপীড়িতা, রমণীর দুঃখময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছেন; তিনিই কেবল বুঝিতে পারিয়াছেন। নতুবা অন্যের কি সাধ্য যে, তাহা মনে ধারণা করিয়া আনয়ন করে, বা লেখনীর সাহায্যে ব্যক্ত করে। যদিও আমি এই সংসারাস্থিতা, পতি বিয়োগবিধুরা, ও বারবণিতাসক্ত পতির অত্যাচার প্রপীড়িতা, রমণীর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, তদ্বিষয় বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; তথাপি আমি এই পতি সহবাসে বঞ্চিতা, বিরহিণীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সহানুভূতি প্রকাশ করা ভিন্ন, লেখনীর সাহায্যে কোন প্রকারে কুলকলঙ্কিনী বারনারীগণের কুপ্রবৃত্তির, দুশ্চরিত্রতার, প্রতারণার, ও বিশ্বাসঘাতকতার, বিষয় বর্ণনা করিয়া, সংসারস্থ অন্যান্য যুবকগণের হৃদয়ে, বারবণিতাগণের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করিয়া দিয়া, তাহাদের সহধর্ম্মিণী গণের উপকার করিতে সক্ষম হইব, এরূপ প্রত্যাশা করি না—তজ্জন্য সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। কিন্তু এই সংসারস্থিতা বিরহ প্রপীড়িতা, অভাগিনীর সজল নয়ন, ও ম্লান বদন, দর্শনে শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে, এই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ

ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে, দূর হইতে বিন্ধ্যাচলের শিখর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বোধ হইল যেন, মেঘ সকল, পৃথ্বীতল বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র বাহু বিস্তার পুর্ব্বক গগণ মার্গ স্পর্শ করিয়াছে। এই রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে, ক্রমে বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী হইয়া এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর্ব্বতের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মরি! মরি!! কি অপূর্ব্ব শোভা।

অধিত্যকা ভূমি হইতে বিন্ধ্যাচলের এই রূপ, মনোহারিণী ও চিত্তচমৎকারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া, পরম পুলকিত হৃদয়ে, অচলোপরি আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু গিরি-শৃঙ্গে আরোহণোপযোগী কোন পথই পাইলাম না; অথচ তখন এমন কোন উপায় নির্দ্ধারণ বা কোন সুকৌশল আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলাম না, যদ্দ্বারা শৈলোপরি আরোহণ করিতে পারা যায়। বিশ্বশিল্পের এই অতুলনীয় শিল্প চাতুর্য্য দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া, কেবল সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অনি-মিষ নয়নে পর্ব্বতের বাহ্যিক শোভা নিরীক্ষণ করি-তেছি, এবং মনে মনে চিন্তা করিতেছি, যখন পর্ব্ব-তের বাহ্যদেশ এমন সুন্দর, না জানি ইহাঁর অভ্যন্তর,

গিরিগুহা, ও শিখর দেশ, আরও কত মনোহর! হায়! আমি অতি মন্দ ভাগ্য নচেৎ এমন সুখে বঞ্চিত হইব কেন!

পৃথিবীর অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অনেকানেক নগর, উপনগর, নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি আশ্চর্য্য বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিয়াছি। বহুজন সমাকীর্ণ জন পদে প্রবিষ্ট হইয়া, জনপদবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের; বহুমূল্য প্রস্তরবিনির্ম্মিত, নানাবিধ বর্ণে সুরঞ্জিত; ও অত্যুজ্জ্বল মণি মাণিক্যে সুশোভিত, ভূরি ভূরি প্রাসাদ পুঞ্জ নিরীক্ষণ করিয়াছি; ঘোরা রজনীতে সুবিস্তৃত বেগবতী স্রোতস্বতী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, কল্লোলিনীর মধুর কল কল ধ্বনি, ও পণ্য-দ্রব্য পরিপূর্ণ পোতবাহি গণের সুমধুর সঙ্গীত, ও তাহাদের ক্ষেপণী নিক্ষেপের মনোমুগ্ধকর "ঝুপ্ ঝুপ্" শব্দ ও শ্রবণ করিয়াছি; এবং ঐ সমস্ত পোত বিনিসৃত, দীপাবলীর আলোকে প্রতিফলিত, তটিনী অঙ্গের সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিয়াছি; দিবাবসান সময়ে সরোবর তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, নির্ব্বাত সলিলের প্রশান্ত মূর্ত্তি, মরালগণের মৃদুমন্দ গতি, গুঞ্জরণকারী ভ্রমরগণের পদ্ম মধুপানে আসক্তি দেখিয়া, অস্তগমোন্মুখ বৃদ্ধ তপনের রক্তিমা বর্ণ, বিয়োগ বিধুরা অর্দ্ধনিমীলিতা অধোমুখী পদ্মিনীর

দুঃখপূর্ণ মুখবিকৃতি, অৰ্দ্ধোন্মুখিতা ঊৰ্দ্ধমুখী কুমুদিনীর মৃদু মধুর হাস্য, এবং নবোদিত পূর্ণ চন্দ্রের অমৃত মাখা মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য; সুন্দর শোভা কুত্রাপি দৃষ্টি করি নাই। হা জগদীশ্বর! কেন আমার এমন সাধে বাদ সাধিলে? হা চরণ! সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া, এক্ষণে অচল দেখিয়া তুমিও কি অচল হইয়াছ? হা নয়ন! তুমি যে দৃষ্টিতে মেঘাচ্ছাদিত অমানিশার অন্ধকার রজনীতেও নিবিড় অরণ্যে পথ দর্শন করিয়া গমন করিতে সমর্থ হইয়াছ, এক্ষণে তোমার সে বহু দূরগামী তীব্র দৃষ্টি কোথায় রহিল? হা সূক্ষ্মবুদ্ধি! তুমি সুকৌশল উদ্ভাবন করিয়া অনেক বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে তোমার সে কৌশল উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা কোথায় রহিল? হা হস্ত! তোমার সহায়ে আমি অনেক উচ্চ বৃক্ষে ও অনেক উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে, সময় গুণে তুমিও কি অবসন্ন হইয়াছ? হায়!! এক্ষণে কি আমার এমন কোন সুহৃৎ নাই যে, আমাকে পৰ্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার সুপথ দেখাইয়া দেয়? হায়! আমি কি হতভাগা! আমার অদৃষ্টের দোষে, আমায় চির আজ্ঞাধীন ইন্দ্রিয়গণও আমার অবাধ্য হইয়াছে; নতুবা যাহারা; ইচ্ছা মাত্রেই অভিলষিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত

হইত, আজ কেন তোষামোদ করিয়াও তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেছি না! অথবা তাহাদের স্ব স্ব জীবনীশক্তিই কি অন্তর্হিত হইয়াছে? হইতে পারে! জীবনের কার্য্য শেষ হইলে, সকলেই জীবন পরিত্যাগ করে। চক্ষুর জীবনের কার্য্য দর্শন, কিন্তু আজ বুঝি, চক্ষুর দর্শনের সার্থকতা সম্পন্ন হইয়াছে, তাই বুঝি; চক্ষু জীবন পরিত্যাগ করায় তাহার দৃষ্টি শক্তির লোপ হইয়াছে; তজ্জন্যই সে আপন কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ আছে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তাহাদের অধিপতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। তবে আর আমার জীবন ধারণ কিজন্য? আমিও জীবন পরিত্যাগ করিব। কাশীধাম হইতে, গুরুদেবের নিকট বিদায়কালে, গুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, আমার সহিত অদর্শন কাল পর্য্যন্ত, তুমি, তোমার ঈপ্সিত স্থান সকল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিও; আমিও, তাহাতে সম্মত হইয়া গুরুদেবের নিকট বিদায় হইয়াছিলাম; কিন্তু আজ যখন আমি আমার, ঈপ্সিত স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না; আজ যখন আমি, গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হইলাম না; আজ যখন আমি, নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইলাম; তখন আমি নিতান্ত কাপুরুষ,

নিতান্ত হতভাগ্য, ও একান্ত কৃতঘ্ন। গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, গুরুদেব যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কেমন বৎস! আমার উপদেশ মত সমস্ত কার্য্যই ত সম্পাদিত হইয়াছে? তখন আমি কি উত্তর দিব? তখন আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এ মুখ দেখাইব? তখন আমি কি প্রকারে তাঁহাকে বলিব যে, দেব! তোমার হতভাগ্য সন্তান, এবার নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়াছে; নিজ অক্ষমতা প্রযুক্ত তোমার আদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হয় নাই।

হায়! তখন তিনি কি মনে করিবেন? তখন তিনি, কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? হয়ত, মিথ্যাবাদী ভাবিয়া আমার প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক কটাক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, হয়ত, কাপুরুষ ভাবিয়া আমার সহিত আর বাক্যালাপ করিবেন না, হয়ত আমাকে অবাধ্য মনে করিয়া ক্রোধান্ধরক্তিম নয়নে আমার উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন? উঃ! সেই দীর্ঘাকার মহাপুরুষ, সেই আজানুলম্বিত বাহুযুগল, ও সেই পাদ-দেশলম্বিত জটাজাল, সেই গম্ভীর বদন মণ্ডল, সেই শ্বেত শ্মশ্রু, সেই আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, তাহা আবার ক্রোধে রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। উঃ! চক্ষু হইতে যেন নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। যখন সেই ভীম মূর্ত্তিতে, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া,

প্রজ্বলিত নয়নে, আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন, হতভাগ্য! যখন তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া, আমার আদেশ অবজ্ঞা করিয়াছ, যখন তুমি আমার উপদেশ বিস্মৃত হইয়া, আপন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছ, যখন তুমি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছ, তখন তুমি আমার শিষ্যনামের উপযুক্ত নও। তখন তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক, ও একান্ত মিথ্যা-বাদী; আর আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে কিম্বা তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। জগতে কাপুরুষ নামে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, পুরুষের পক্ষে মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। এক্ষণে তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আমাকে আর যেন তোমার মুখাবলোকন করিতে না হয়। হায়! তখন যে আমার কি অবস্থা সংঘটিত হইবে; তাহা আমি এক্ষণে কল্পনাতেও অনুধাবন করিতে পারিতেছিনা। গুরুদেবের নিকট এরূপ প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ দ্বারা; তাঁহার ঘৃণার পাত্র হওয়া অপেক্ষা, মৃত্যু শতগুণে মঙ্গল। যে গুরুদেব, আমাকে দেখিলে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে, আমার শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল জানিবার জন্য উৎসুক হইতেন, সেই গুরুদেব, আমাকে দেখিলে, যে ঘৃণাব্যঞ্জক ভ্রূকুটিতে

আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন; যে গুরুদেব, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, নিরন্তর নানাবিধ উপদেশ বাক্য দ্বারা আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই গুরুদেব, আমাকে সম্মুখে দেখিলে আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, ইহা আমার কখনও সহ্য হইবেক না। অতএব অদ্য যখন ঈপ্সিত স্থান পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া তাহার শোভা সন্দর্শনে অক্ষম হইয়া, গুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালনে অসমর্থ হইলাম, ও নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলাম; তখন আর আমি জীবন ধারণ করিব না। এই ভাবিয়া, মৃত্যুর জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, এমন সময়ে, হঠাৎ আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া সমস্ত শরীর অবসন্ন করিল, চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। গুরুদেবের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে হইল না ভাবিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিলাম; আর যে আমার চৈতন্য লাভ হইবে, ইহা আমার মনে একটী বারও উদয় হয় নাই।

কতক্ষণ পরে ও কি প্রকারে যে আমার চৈতন্য লাভ সংঘটিত হইল, তাহা আমি বলিতে পারিনা। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দর্শন করিলাম,

তাহাতে, যুগপৎ বিস্মিত ও পরম পুলকিত হইলাম। আহা কি রমণীয় স্থান! বহুদিন হইতে যে স্বর্গকে পরম রমণীয় স্থান বলিয়া মনের ধারণা ছিল; অদ্য এস্থানের শোভা সন্দর্শনে মনের সে ধারণা দূর হইল। এখানে যেন চির বসন্ত বিরাজ করিতেছে, পক্ষিগণ মনোমুগ্ধকর কাকলী ধ্বনিতে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে, মলয়ানিল অপূর্ব্ব সৌরভ বহন করিয়া, মৃদু মন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া, জীবের মন প্রাণ হরণ করিতেছে, এস্থানে আগত না হইলে, আমার সংজ্ঞালাভ হওয়া কঠিন হইত। কিন্তু আমি যে কি প্রকারে, কোন্ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই পরম রমণীয় স্থানে আনীত হইয়াছি তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছিনা। পরন্তু ইহা জানিবার জন্য উৎসুক নেত্রে, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে গুরুদেবের সেই মোহনমূর্ত্তি আমার নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি আমাকে প্রথম দর্শন মাত্রেই, বলিলেন বৎস! এক্ষণে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে ত? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি তুমি জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হও নাই। আত্মহত্যা মহাপাপ, সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহা কি তুমি অবগত নও? আর তুমি আপন ইচ্ছাক্রমে সেই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছিলে, যাহা হউক আর ভ্রম ক্রমেও,

মনে, ওরূপ ইচ্ছাকে স্থান দিওনা। তোমার কর্ত্তব্য পালনে তৎপরতা, আদেশ প্রতিপালনে বিশেষ মনোযোগিতা দর্শন করিয়া, আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। এস্থানে তোমার আগমনের বিষয় জানিতে পারিয়া, তোমার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আমি অদ্য চারি দিন হইল, এস্থানে আগমন করিয়াছি। আর তোমাকে একাকী পর্য্যটন করিতে হইবে না। অতঃপর আর আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করিব না। এক্ষণে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিয়া কিরূপ দর্শন ও জ্ঞানলাভ করিলে, তাহা এক বার সবিশেষ বর্ণনা কর, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

---

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভো! বহুদিন অবধি ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া; ভারতের অনেক স্থান দর্শন করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসিগণের সহিত ব্যবহার করিয়া, তাহাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে অবগত হইয়াছি। ভারত-বর্ষস্থ বহু বহু প্রশস্ত প্রশস্ত প্রান্তর, নদ নদীও দর্শন করিয়াছি; কিন্তু প্রভো! কোন স্থানে আরাম নাই। আরাম নাই!! শান্তি নাই! শান্তি নাই!! দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী, বিকট মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক ভারতের সর্ব্ব-স্থান পরিভ্রমণ করিতেছে। ভারতবাসিগণ সকলেই সেই রাক্ষসীর ভয়ে ভীত; প্রান্তরে শস্য নাই, নদীতে বাণিজ্য জাহাজ নাই, বিপণিতে শিল্পজাত দ্রব্য বিদ্য-মান নাই, রাজবাটীতে অর্থ নাই, রাক্ষসী সমস্তই গ্রাস করিয়াছে। দেশ মধ্যে কেবল হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কি পর্ণাচ্ছাদিত কুটীরমধ্যস্থ গলিতবসন-পরিহিত অন্নাভাবে শীর্ণকায় দরিদ্রবর্গ, কি নানাবিধ বিলাস দ্রব্য পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যমধ্যগত বিবিধ রত্নাভরণসংযুক্ত রাজবেশপরিহিত ধনাঢ্য ব্যক্তি সমূহ; কি সাধারণ গৃহাভ্যন্তরস্থ ভদ্রবেশাচ্ছাদিত

মধ্যবিদ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ কাহারও মুখে আনন্দ ধ্বনি নাই। কেহবা ধূলি শয্যাশায়ী হইয়া অনাহারে ক্ষীণকণ্ঠে হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া রোদন করিতেছে; কেহবা রাজ সিংহাসনে অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া করলগ্ন কপোলে দেয় রাজস্ব সংগ্রহে অক্ষম হইয়া অর্থ চিন্তা করিতেছেন, কেহবা নিজ নিজ শিশু সন্তানে পরিবৃত হইয়া তাহাদের অনাহার জনিত করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া ধার্য্য ট্যাক্স সংগ্রহ জন্য অর্থ অন্বেষণ করিতেছে, সুখ নাই, শান্তি নাই, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী সমস্তই গ্রাস করিয়াছে। হায়! অভাগার কি কষ্ট! বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, আত্মীয় বর্গ তাহা সমস্তই হস্তগত করিয়াছে; জ্ঞাতিবর্গ বিষয়াদি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে নিরাশ্রয় অবস্থায় উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া কেবল পথে পথে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছে। দেশ মধ্যে এমন কোন পান্থশালা, কি অতিথি শালা, কি অনাথাশ্রম নাই যে, অভাগা তথায় এক দিন অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে; এবং বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে; এতদ্দেশের প্রায় সমস্ত গৃহস্থই, এমনই দরিদ্র হইয়াছেন যে, দেশ মধ্যে এমন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি প্রতিদিন ২। ১ জন ব্যক্তিকে অকাতরে অন্নদান করিতে পারেন।

দেশ মধ্যে যাঁহারা মহারাজা আখ্যাধারী ভূস্বামীবর্গ তাঁহারাও একণে নিঃস্ব হইয়াছেন; তাঁহারা অন্ন বিতরণ করিবেন কি, তাঁহারা নিজের অন্নাহরণের চেষ্টায় নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত, নিয়মিত রূপ কৃষির অভাবে ও অন্যান্য নানা কারণে, একণে বঙ্গদেশের ভূমি সকল অনুর্ব্বরা হইয়াছে; তাহাতে যে পরিমাণে শস্যোৎপাদন হইতে পারে, ক্ষেত্রস্বামীর তাহাও রক্ষা করা কষ্ট, চোর ডাকাইত প্রতারক ইত্যাদি অসচ্চরিত্র ব্যক্তিবর্গ, হয় ক্ষেত্রস্বামীর অসাক্ষাতে অপহরণ করিয়া লয়, নতুবা তাঁহার সাক্ষাতে বল প্রয়োগে হস্তগত করে, কিম্বা কোন প্রকার কৌশলে প্রতারণা দ্বারা তাহাকে বঞ্চিত করে, এবম্প্রকারে অনেক কষ্টে অনেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, যে কিছু শস্য অভাগার গৃহে সঞ্চিত হয়, ঐ শস্য-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা, সে নিজ পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবে, না মহাজনের আসল টাকার সুদ দিবে? না গবর্ণমেণ্টের ধার্য্য ট্যাকস দিবে? না জমিদারের খাজনা দিবে? কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারেনা। সম্মুখে স্ত্রী পুত্র অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে, কোন্ কাপুরুষ ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারে? সুতরাং অর্থব্যয় করিয়া, যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর দিতেই নিঃশেষিত হয়। না দিলে

এখনি হয়ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির অঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কার আকর্ষণ করিয়া লইবে, নাহয় ওয়ারেণ্ট জারী দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিবে, কি সর্ব্বনাশ! কাযেই উদরান্নেরও কষ্ট প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর লোকে বাধ্য হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রদান করে। জমিদারের খাজনা আর কি প্রকারে পরিশোধ হইবে? জমিদারগণ কি করিবেন, তাঁহারা ইংরাজের আইনের বাধ্য, তাঁহাদের প্রজার দ্রব্যাদি জোর করিয়া লইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদের ওয়ারেণ্ট নাই, তাঁহারা প্রজার মুখের অন্ন বলপূর্ব্বক গ্রাস করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের প্রাপ্য রাজস্ব আর কিপ্রকারে শোধ হইবে, এই রূপে অর্থ সংগ্রহে অক্ষম হইয়া রাজস্ব দিবার ধার্য্য দিন আগত দেখিয়া জমিদারগণ নিরন্তর অপার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, কিন্তু ভাবিয়া কি করিবেন, আইনের কি দয়া মমতা আছে?

এতদ্দেশীয় ভুস্বামীবর্গ, প্রজার নামে রাজস্ব বাকীর অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রজাগণ, তাঁহাদিগকে তাহাদের দুরবস্থা জানাইলে, তাঁহারা সাধ্যমত সুদ ও খরচা ত্যাগ করিয়া প্রজাগণকে টাকা আদায় জন্য ৩। ৪ বৎসর, এমন কি ১০। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সময় দিয়া থাকেন; এবং তাঁহারা, তাহাদের

নিকট হইতে সাধ্যানুসারে প্রদত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ লই-য়াই তাহাদিগকে দেনার দায় হইতে অব্যাহতি দেন। হায়! গবর্ণমেণ্ট কি প্রজাদের প্রতি সেই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন? গবর্ণমেণ্টের আইন জড় পদার্থ, তাহার চক্ষু নাই, সে কিছু দেখিতে পায় না। তাহার কর্ণ নাই, সে কিছু শুনিতে পায় না। তুমি বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় চক্ষের জলধারা নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীকে প্লাবিত করনা কেন, তুমি গম্ভীর নিনাদিনী কাদম্বিনীর ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া গগণমার্গ বিদীর্ণ করনা কেন, তথাপি সে কিছু দেখিতে পাইবে না; তথাপি সে কিছু শুনি-তেও পাইবে না। তোমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ও যে করুণস্বর শ্রবণ করিয়া, আমাদের দেশজাত অতি ক্ষুদ্র জমিদারগণও, তোমাকে সমস্ত খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি দেন; তুমি সেই বিরস ও শুষ্ক মূর্ত্তিতে, সকরুণস্বরে নিরন্তর ক্ষমা প্রার্থনা করনা কেন, সে তোমার কথায় একবারও কর্ণপাত করি-বেনা, তোমাকে একপাইও সুদের দায় হইতে অব্যা-হতি দিবেনা, তোমাকে টাকা আদায় জন্য এক মিনি-টেরও অবকাশ দিবেনা। সুতরাং আর অনিত্য চিন্তায় ফল কি? অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই সংঘটিত হইবে।

প্রজাগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, ভূস্বামীবর্গ এবম্প্রকারে স্ব স্ব বিষয় সম্পত্ত্যাদি হারাইয়া, তাঁহারাও এক্ষণে দরিদ্র হইয়াছেন। তাঁহাদিগকেও এক্ষণে হয়ত অনেক দিন অনাহারে দিন যাপন করিতে হয়। তাঁহারা এক্ষণে অপরকে কি প্রকারে আহার্য্য বস্তু প্রদান করিবেন? এইরূপে অভাগা, অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। এবং ক্রমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, জ্ঞানীলোকের নিকট উপদিষ্ট হইয়া, আপনার অপহৃত বিষয় পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ধর্ম্মগৃহ আদালতের ধর্ম্মাবতারের নিকট অভিযোগ করিল। বিচারের দিন উপস্থিত হইল; তাহাকে সেই দিন সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মাবতারের নিকট হাজির হইতে হইবে; অনেক কষ্টে, অনেক তোষামোদ করিয়া, অভাগা সাক্ষিগণকে হুজুরের সম্মুখে হাজির করিল, কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর স্থান! এখানেও সকলে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ন্যায় পয়সা! পয়সা!! টাকা! টাকা!! করিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অভাগা কত কষ্টে, কত তোষামোদ করিয়া, সাক্ষিগণকে, আদালত প্রাঙ্গনে হাজির করিল, কিন্তু আমলা বাবুরা নিয়মিত রূপ পয়সা না পাইলে সাক্ষিগণকে হুজুরের সম্মুখে হাজির হইতে দিবেন না

বলিলেন! উকীল বাবু অদ্য আবার ফিসের টাকা না পাইলে তাহার স্বপক্ষে একটা কথাও কহিবেন না। অভাগা এবার বিষম বিপদে পতিত হইল, ম্লান-বদনে, দুঃখবিকৃতস্বরে, চক্ষের জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, হতভাগা, তাহার সমস্ত দুরবস্থা উকীলবাবুর নিকট পরিচয় দিল; ভাবিল, উকীলবাবু তাহার দুর-বস্থা শ্রবণে দয়াদ্র চিত্ত হইয়া তাহাকে অর্থের দায় হইতে অব্যাহতি দিবেন। কিন্তু অভাগার ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল সংঘটিত হইল। টাকা না পাইয়া উকীলবাবু তাহাকে কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন। হা হতভাগা! তুমি কি জাননা গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত আইনশিক্ষিত উকীলবাবুগণ নিরস আইনের পাণ্ডুলিপি অভ্যাস করিয়া আপনারাও নিরস হইয়া-ছেন। সুতরাং তাঁহাদের স্নেহ মমতা দয়া প্রভৃতি সরস গুণ সকল কোথা হইতে উদ্ভূত হইবে? পরন্তু তাঁহারা জটিল আইন অভ্যাস করিয়া নিজেরাও ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয় প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা জানিয়াও তাহা বিচারককে সত্য বলিয়া বুঝাইতে রীতিমত চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্ম ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আইনের মর্ম্ম দেখাইয়া ন্যায় অন্যায় করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন। তাঁহাদের কি দয়াধর্ম্ম স্নেহমমতা গুণ আছে?

তাঁহারা এক্ষণে এই সকল গুণের পরিবর্ত্তে উপরোক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা আইন ব্যবসায়ী হইয়া আইনের ন্যায় জড় পদার্থ হইয়াছেন। তুমি শুষ্কমুখে ক্ষীণস্বরে চক্ষু জলে তাঁহাদের পদ প্রক্ষালিত করিলেও তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইবেন না। নিজের শোচনীয় দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া অপরের অশ্রুজলে পৃথিবী অভিষিক্ত করিতে পারিলেও, তাঁহাদের দয়ার সঞ্চার হইবেনা। তবে আর কেন বৃথা চেষ্টা করা? মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের উকীলবাবুগণ, মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা কেমন কৌশলপূর্ব্বক বিচারককে বুঝাইলেন, সাক্ষিগণের জোবানবন্দি গৃহীত হইল, অনেক তর্ক বিতর্ক বাক বিতণ্ডার পর রায় প্রকাশ হইল, ধর্ম্মাবতারের ন্যায় বিচারে অভাগা তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল, হায়! কি হইল! কি হইল! ধর্ম্ম পরাভূত হইল, অধর্ম্ম জয় লাভ করিল, ন্যায় অন্যায় হইল, সত্য মিথ্যা হইল, মিথ্যা সত্য হইল, এই কি ধর্ম্ম গৃহ? এই কি ধর্ম্মাবতারের ন্যায় বিচার। ন্যায় বিচারের কি এই পরিণাম! ইহাতে কি লোক সকল প্রকৃত বিষয়ে বঞ্চিত হয়। বিচারকেরই বা দোষ কি? তিনি অবশ্য আইন মত বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এই কি

ইংলণ্ডীয় আইনের মর্ম্ম! এই আইনের বিচারে কি নির্দ্দোষব্যক্তি শাস্তি পায়, দোষী ব্যক্তি অব্যাহতি পায়, নিজের সম্পত্তি পরের হয়? নচেৎ অভাগা তাহার প্রকৃত বিষয়ে বঞ্চিত হইবে কেন? আদালতের এই রূপ বিচারে অধর্ম্মের স্রোত দিন দিন প্রবল হইতেছে, অধার্ম্মিকগণ প্রশ্রয় পাইয়া নানাপ্রকার অযথা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া, মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধিকরিতেছে। দেশের সমস্ত অর্থ বিনা ক্লেশে রপ্তানি দিতেছে, দেশকে দৈন্য দশা প্রাপ্ত করিতেছে, ভদ্রলোকদিগকে ব্যতিব্যস্তক রিয়া তুলিতেছে, তবে আর ভারতবর্ষে শান্তি কোথায়? যেদেশে মোকদ্দমার সংখ্যা এত অধিক, সে দেশে কি প্রকারে শান্তি বিরাজ করিবে? সে দেশের লোক কেমনে সুখী হইবে? যদি মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক হইলে দেশের শান্তি হয়, যদি মোকদ্দমায় প্রত্যেক গৃহস্থের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হইলে, লোক সকল সুখী হয়, যদি এই রূপ অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া আদালতের সুবিচারে লোক সকল প্রকৃত বিষয়ে বঞ্চিত হয়, হে প্রভো! তাহা হইলে ভারতে শান্তি আছে, তাহা হইলে ভারতবাসীগণ সুখে আছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে নিয়তই সুবিচার হইতেছে। এইরূপ সুবিচারে হতভাগা তাহার পৈত্রিক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া,

অনন্যোপায় হইল। এবং পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা কিছু সংগ্রহ করিয়া, ব্যবসায় আরম্ভ করিল। অল্পদিনের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে নিজের উন্নতি সাধন করিল। কিন্তু মন্দভাগ্যের অদৃষ্টে কত দিন সুখ থাকে? তাহার কি উন্নতি হয়? কখনই নহে। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী, পুনরায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক, তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। তাহার উপর নানা প্রকার ট্যাক্স ধার্য্য হইল। এদিকে অভাগার ভাগ্যদোষে তাহার ব্যবসায় অবনতি হওয়ায়, তাহার সুঅবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া দুরবস্থায় পরিণত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে, তাহার উন্নতি অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ধার্য্য কর, তিরোহিত হইল না। এক্ষণে তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করাই সুকঠিন হইয়াছে। তাহাতে আবার সে তাহার ধার্য্য ট্যাক্স কোথা হইতে দিবে। আজ ট্যাক্স দিবার ধার্য্য দিন, ট্যাক্স দিতে না পারিলে, হয়ত করগ্রাহিগণ তাহার পরিবার বর্গের বস্ত্রালঙ্কার হরণ করিয়া লইবে। নতুবা তাহাকে ওয়ারেণ্ট জারিতে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিবে। তজ্জন্যই অভাগা অদ্য বিষম বিপদে পতিত হইয়া নিজ শিশু সন্তানগণের অনাহার জনিত করুণক্রন্দনে

কর্ণপাত না করিয়া, ট্যাক্স দিবার জন্য অর্থোপায় অন্বেষণ করিতেছে।

এই রূপ ভারতের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই, অন্ন ও অর্থ চিন্তায় বিব্রত। তাহাতে আবার ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব-নাই। ধনী, উচ্চপদাভিষিক্ত, ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ, অহঙ্কারে অন্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মন্দ চেষ্টায় নিয়ত চেষ্টিত থাকেন। কিসে কাহার অনিষ্ট হইবে, ইহা প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই অনুসন্ধান করিতেছে। উন্নতিশীল ব্যক্তির কিসে পতন হইবে, প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি কিসে অখ্যাতি ভাজন হইবে, এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করাই প্রায় সমস্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মিথ্যা নিন্দাবাদ, শঠতা, কপটতা, প্রতারণা, প্রায় অধিকাংশ লোকের ব্যবসায় হইয়াছে। দেশের উন্নতি, স্বজাতির উন্নতি, কিসে হইবে, তাহা প্রায় কেহই ভ্রম ক্রমেও একবার চিন্তা করেন না, চাকরী ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই, ইহা ভারতবাসিগণের মনে এক প্রকার ধারণা হইয়াছে। বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প বিদ্যা, দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসিগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রখর বুদ্ধিও এককালে অস্তমিত হইয়াছে। সুতরাং ভারত যে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইবে তাহার

আর বিচিত্র কি? প্রভো! এই রূপ ভারতবাসিগণ সহায়শূন্য, সম্পত্তিশূন্য, একতাশূন্য, সাহসশূন্য হইয়া, সংসার সাগরের অকুল তুফানে নিরন্তর হাবু ডুবু খাইতেছে। যদি ইংলণ্ড দয়া প্রকাশ করিয়া ভারতবাসিগণকে এ বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন, তবেই রক্ষা, নচেৎ চিরপ্রসিদ্ধা ধনসম্পদশালিনী রত্নগর্ভা ভারতবর্ষ অচিরে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হতভাগা ভারতবাসিগণ যে, এক্ষণে দুরবস্থার শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, ভারতবাসিগণের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ের অভাব হওয়া ভিন্ন, তাহার অন্য কোন কারণ অনুমিত হয় না। যখন হিন্দু-রাজগণ পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহারা কেমন স্বাধীন ভাবে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছেন, যখন ভারতমাতার চারিদিকে হিন্দু-সন্তানগণ কৃত একতা বাঁধ দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত ছিল, যখন তাঁহারা পরস্পরের সুখে পরস্পর সুখী, ও পর-স্পরের দুঃখে পরস্পর দুঃখী ছিলেন, যখন রত্নগর্ভা ভারতমাতা তাঁহার প্রসূত সমস্ত শস্য রত্নাদি, কেবল আপন সন্তানগণের মধ্যেই সামঞ্জস্য রূপে বিতরণ করিয়া অপত্য স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যখন একতাবদ্ধ ভারতসন্তানগণ, জন্মভূমি ভারতের জন্য প্রাণদিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না, তখন ভারতসন্তানগণ এক্ষণকার ন্যায় পরপদতলে দলিত হইয়া নিজ নিজ ধন সম্পত্ত্যাদি বাধ্য হইয়া বিসর্জ্জন করিয়া উদরান্নের জন্য হা অন্ন! হা অন্ন!! করিয়া লালায়িত হইয়া চক্ষের জলে দুঃখের নিবৃত্তি করিতেন না।

তখন অন্ন বিহনে কোন ভারতসন্তান প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, ভারতমাতার পবিত্র অঙ্কে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তখন কোন বিদেশীয় রাজগণ ভারতসন্তানগণের কৃত একতা বাঁধ ভঙ্গ করিয়া ভারতবাসিগণকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া ভারতমাতার মহামূল্য রত্নালঙ্কারাদি হরণ করিয়া ভারতের সুখ স্বচ্ছন্দতা অপার দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া দিতে পারেন নাই। একতা বিহীন হইয়া ভারতবাসিগণের এক্ষণে এত দুর্দ্দশা, এত যন্ত্রণা, এত মন বেদনা। নানাবিধ কারণে ভারতবাসিগণের মধ্যে এক্ষণে একতার অভাব সংঘটিত হইয়াছে, ভারতবাসিগণ এক্ষণে নানা জাতি, নানা শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এবং এক জাতি বা সম্প্রদায়ের সহিত অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের সৌহৃদ্য থাকা দূরে থাকুক, জাতি ও সম্প্রদায় বিশেষে এত উচ্চ, নীচ, ভেদাভেদ দৃষ্ট হয় যে, উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গ নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে অপমান, ও স্পর্শ করিলে অশুচি বোধ করেন। প্রত্যেক শ্রেণীই আবার ২। ৩ দলে বিভক্ত; এমন কি যে পল্লীতে ৫। ৬ ঘর সম শ্রেণীস্থ গৃহস্থ বাস করেন, তাহাদের মধ্যেও অন্ততঃ দুইটী দল আছে। ভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্র-

দায়ের মধ্যে পরস্পরের অনৈক্যের কথা দূরে থাকুক, এক শ্রেণীস্থ ধনবান, ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাহার সম শ্রেণীস্থ নির্ধন বা মূর্খ লোকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে আপনাদিগকে অবমানিত বোধ করেন। স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি চেষ্টা করা দূরে থাকুক, কিসে তাঁহাদের প্রতাপ অপ্রতিহত থাকিবে, কিসে স্বশ্রেণীস্থ সমস্তব্যক্তি তাঁহাদের তোষামোদ করিবে, কিসে তাঁহারা সর্ব্বদা অন্য লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন, এই চেষ্টায় তাঁহারা নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকেন, এবং এই চেষ্টার পরিপোষণে ঘোর অন্যায় কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না, বা অধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। কুপ্রবৃত্তি তাঁহাদের চিরসহচর থাকে, হিংসা পথ প্রদর্শক হইয়া ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে পথ দেখাইয়া দেয়, পদমর্য্যাদা ও উচ্চাভিমান তাঁহাদিগকে জড় পদার্থের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে। বিধাতা অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইবার নিমিত্তই তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। চাকরী প্রায় সমস্ত লোকের ব্যবসায় হওয়াতে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি তোষামোদ ও মনস্তুষ্টি করিতে বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়াছেন। নিরন্তর পরাধীন থাকিয়া স্বাধীনতার বিমল সুখ একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। জ্ঞানোপার্জ্জনের পরিবর্ত্তে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়াছে। অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিদ্যার পরিবর্ত্তে ভারতে এক্ষণে অর্থকরী এক নূতন বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিদ্যাকে ইংরাজগণ প্রধানতঃ ৪।৫ ভাগ, ও তৎপরে অনেক প্রকারভেদে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়া লোকসকল শারীরিক স্বাস্থ্য, বলবীর্য্য জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া ঘোর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। যিনি যত শারীরিক তেজঃ বল-বীর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া যে পরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যে বিভাগে উত্তীর্ণ হইতেছেন তাঁহাকে ইংরাজগণ সেইরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করিতেছেন। এই সার্টিফিকেটর অভাব হইলে অর্থোপার্জ্জনের পথ এককালে রহিত হইয়া যায়, এই সার্টিফিকেট না থাকিলে লোকে আর শিক্ষিত মধ্যে পরিগণিত করে না। তুমি রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া নানা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ কর না কেন; তুমি রীতিমত জ্যোতিষ অভ্যাস করিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ঘটনাবলী নিরূপণ করিতে সক্ষম হও না কেন, তুমি কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্য, শিক্ষা করিয়া মানব-গণের জীবনোপায় নানাপ্রকার শস্যোৎপাদনের সুপথ আবিষ্কৃত কর না কেন, নানাপ্রকার অত্যা-শ্চর্য্য বস্তু প্রস্তুত দ্বারা শিল্পকরের শীর্ষ স্থান

আরোহণ করনা কেন, নানাদেশীয় দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানি দিয়া স্বদেশের অভাব দূরীকৃত করনা কেন, তথাপি তুমি পণ্ডিত নামের যোগ্য হইবেনা, তথাপি তুমি শিক্ষিত মধ্যে পরিগণিত হইবে না, তথাপি লোকে তোমাকে গ্রাজুয়েট্ বাবুদের ন্যায় মান্য বা সমাদর করিবে না। কিম্বা গবর্ণমেণ্ট তোমাকে, সেরূপ সার্টিফিকেট্ প্রদান করিবেন না, যে সার্টিফিকেটের বলে উচ্চ পদবীতে অভিষিক্ত হওয়া যায়।

হা ভারতবর্ষ! তুমি এক্ষণে এই প্রকার অধঃপাতে গিয়াছ বটে, তাহা না হইলে তোমার সন্তানগণের এক্ষণে এত কষ্ট কেন হইবে? যে সময় অসংখ্য অসংখ্য অস্ত্র শিক্ষালয়, যুদ্ধ বিদ্যালয়, ও শিল্প শিক্ষাগারে, তোমার অঙ্গ সুসজ্জিত ছিল, যে সময় তোমার সন্তানগণ রীতিমত অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, নিরন্তর যুদ্ধামোদে আমোদিত থাকিত, যেসময়ে তোমার সন্তানগণের বীরত্বভাবে কোন বিদেশবাসীগণ ভারতে আসিতে সাহস করিত না, যেসময়ে তোমার সন্তানগণ কেবল বাহুবলে, ও কোটী দেশস্থ তরবারিবলে, সহস্র সহস্র সৈন্য কামান গোলা গুলি সহ ফেরুপালের ন্যায় বিদেশাগত ম্লেচ্ছদিগকে সিন্ধুনদ পার করিয়া দিয়াছিল, সে সময়

তুমি বীরপ্রসবিনী বলিয়া সমস্ত পৃথিবী মধ্যে পরিগণিতা ছিলে।

যে সময় মহাবীর রামচন্দ্র অযোধ্যায় যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, বাহুবলে হিমালয় হইতে সাগর পার-স্থিত সিংহল দেশ পর্য্যন্ত আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, হিন্দু জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; যে সময় ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে, গঙ্গাকুমার ভীষ্মের বীরত্বে দেবরাজ ইন্দ্র এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্তও তোমার সন্তানগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া ছিলেন; যে সময়ে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজগণ, বাহুবলে তোমার পূর্ব্ব সন্তানগণের প্রতাপ রক্ষা করিয়া, তরবারি প্রভাবে কামানের গোলাকেও পরাভূত করিয়া, স্বাধীন ভাবে আপনাদের আধিপত্য বিস্তৃত রাখিয়া, স্বদেশ মধ্যে জয়পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছিলেন; ও স্বদেশের ধন সম্পদ রক্ষা করিয়া, ধনরত্নে দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া ছিলেন; সে সময় পর্য্যন্তও তুমি রাজমাতা, রত্নগর্ভা, বলিয়া সর্ব্বত্র আদরনীয়া ছিলে। আর এক্ষণে নয়ন তৃপ্তিকর নানাবর্ণে চিত্রিত দ্বিতল ত্রিতল সৌধ সুবলিত বি এ, এম্ এ, বি এল্, এম্ ডি প্রভৃতি [illegible]র আকর স্থান বহুল কলেজে তোমার [illegible]জ্জিত করিয়া, এবং তোমার সন্তানগণ

ঐসকল বিদ্যালয়ে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, সম্মান সূচক সার্টিফিকেট বলে অত্যুচ্চ ও অদ্বিতীয় পদবীতে আরোহণ করিয়াও, তোমাকে সুখী করিতে পারিতেছেন না।

তোমার বীরমাতা, রাজমাতা ও রত্নগর্ভা নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এক্ষণে তুমি দাসমাতা বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিতা হইয়াছ, এবং সমস্ত দেশ অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্না হইয়া চক্ষুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া, অপরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ।

---

সমাপ্ত।